আমি যেভাবে পড়তাম

ড. আয়েয আল করনী

অনুবাদক পরিচিতি

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম।

সহজ সরল মেধাবী ও কর্মতৎপর একজন মানুষ। মাদরাসা-শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় বোর্ডপ্লেস করার মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি। কর্মজীবনে শিক্ষকতার পেশায় তিনি যে প্রতিষ্ঠানে গিয়েছেন, সেখানেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। মাঝে দুটি মাদরাসায় প্রায় ৮/৯ বছর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেও সুনাম কুড়িয়েছেন। এত অল্প বয়সেও তিনি এ পর্যন্ত যেসব সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত হয়েছেন, সবগুলোতে সর্বোচ্চ পদ অলংকৃত করেছেন।

তাঁর লেখালেখিতে প্রবেশের বয়স এখনও এক দশক হয়নি; কিন্তু মৌলিক, অনুবাদ এবং সম্পাদনা মিলিয়ে তাঁর অনেকগুলো বই ইতোমধ্যে বাজারে এসেছে। তাঁর অনুবাদ এত প্রাঞ্জল যে, সেটি তরজমা না কি মৌলিক লেখা- ঠাওর করা যায় না। আর মৌলিক লেখায় তো এমন রস দিতে পারেন যে, ধর্মীয় শুষ্ক বিয়য়গুলোও তাঁর হাতে রসকদম্ব হয়ে ওঠে। মুহাম্মাদ আবদুল আলীম বর্তমানে ঢাকা গেণ্ডারিয়ার জামালুল কুরআন মাদরাসার মুহাদ্দিস। তাঁর জন্ম ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৮২ বাংলা সনে।

আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন।

মুহাম্মদ দিলাওয়ার হোসাইন
পরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন
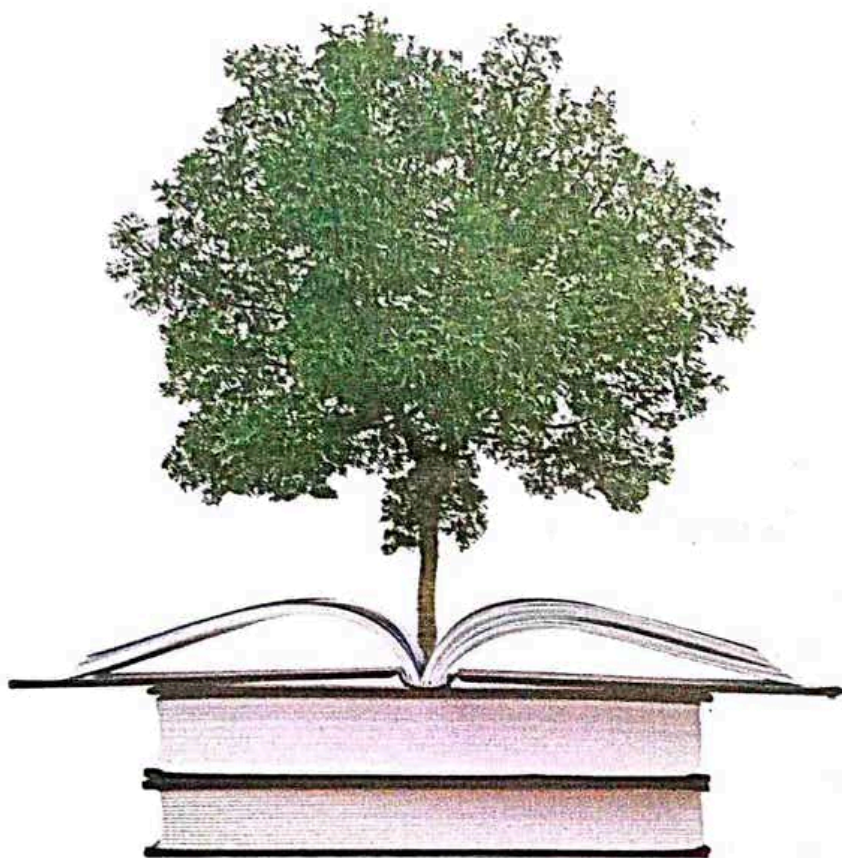
আমি যেভাবে পড়তাম

মূল

ড. আয়েয আল করনী

সৌদিআরব

ভাষান্তর

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

মুহাদ্দিস, জামালুল কুরআন মাদরাসা

গেন্ডারিয়া, ঢাকা

আমি যে ভাবে পড়তাম

ড. আয়েয আল করনী

ভাষান্তর
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

প্রকাশনা
৩৮ [আটত্রিশ]

প্রকাশকাল
মে ২০১৭

প্রকাশক
হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তণুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ২৮০ টাকা মাত্র

সূচি

ডক্টর আয়েয আলকারনী

জীবদ্দশায় খুব মানুষই খ্যাতির চূড়ায় আরোহন করতে পারেন। বিশেষ অবদানের কারণে যারা খ্যাতি অর্জন করেন, তাদের সুনাম সাধারণত মৃত্যুর পর ছড়িয়ে পড়ে। মানব-ইতিহাসে কিছু লোকের ব্যতিক্রম রেকর্ড আছে। তারা দুনিয়ায় থাকতেই তাদের খ্যাতির চূড়ান্ত সীমা দেখে যান। এখন আমরা যার কথা আলোচনা করছি, তিনি এই ব্যতিক্রম রেকর্ড সৃষ্টিকারী লোকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি এখনও জীবদ্দশায় আছেন এবং বিভিন্ন পন্থায় ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন।

তাঁর নাম আয়েয ইবনে আবদুল্লাহ আল-কারনী। জন্ম দক্ষিণ সৌদী আরবের কার্‌ন জেলায় আল-শুরাইহ নামক গ্রামে। ১৩৭৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৯ ইং সনে।

ছোট্ট বেলায়ই এই ডক্টর কুরআনের হিফজ সম্পন্ন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন আল সালমান স্কুলে। তিনি নিজেই লিখেছেন, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তাঁর কখনও ফরজ সালাত ছুটে হয়নি। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন রিয়াদে। আর উচ্চতর পড়াশুনা সম্পন্ন করেন প্রাদেশিক শহর আবহায়। তাঁর পিএইচডি'র বিষয় 'মুখতাসার সহীহ মুসলিম'।
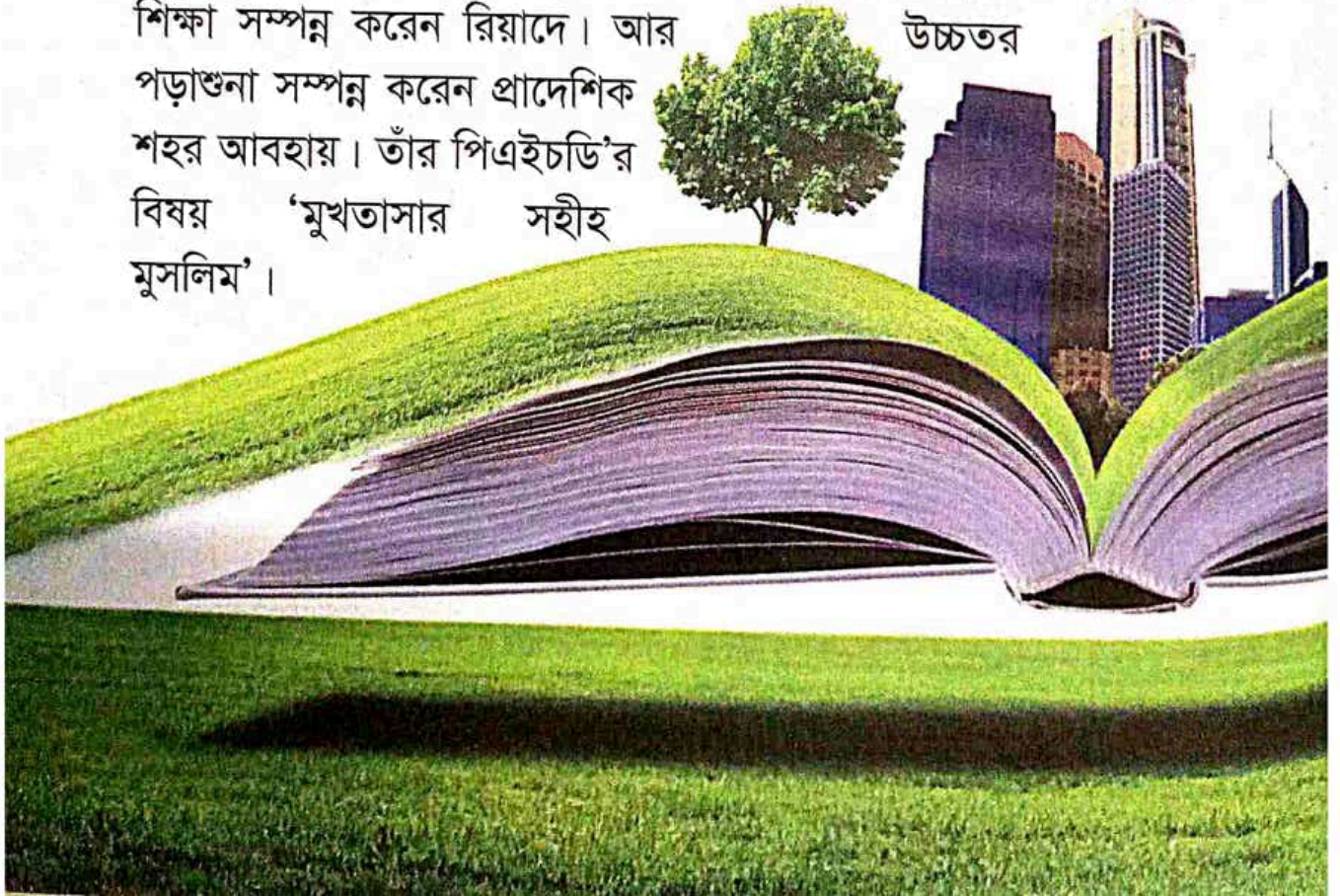
কর্মজীবনের শুরুতে তিনি আব্হা'র আবু বকর সিদ্দীক জামে মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন।

ড. আয়েয আল-কারনী সুনামের সাথে একামেডিক পড়াশোনার পাট চুকানোর পর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে মনোযোগ দেন। এক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তীদের পড়াশোনার স্মৃতি তাজা করেন। তাঁর পড়াশোনার সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে তিনি যেকোন গ্রন্থের আগাগোড়া অধ্যয়ন করে থাকেন। যেহেতু কুরআন মাজীদ আগেই হিফজ করেছিলেন, এজন্য ব্যক্তিগত পড়াশোনার সূচনা করেন, কুরআন মাজীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মাধ্যমে। পড়ে ফেলেন–

০১. তাফসীরে জালালাইন

০২. মুফরাদাত (মাখলূফ)

০৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর [এই তাফসীর তিনি অনেক বার পড়েছেন।]

০৪. তাফসীরে ইবনে জারীর

০৫. যাদুল মাসীর (ইবনুল জাওযী)

০৬. কাশ্শাফ (যামাখশারী)
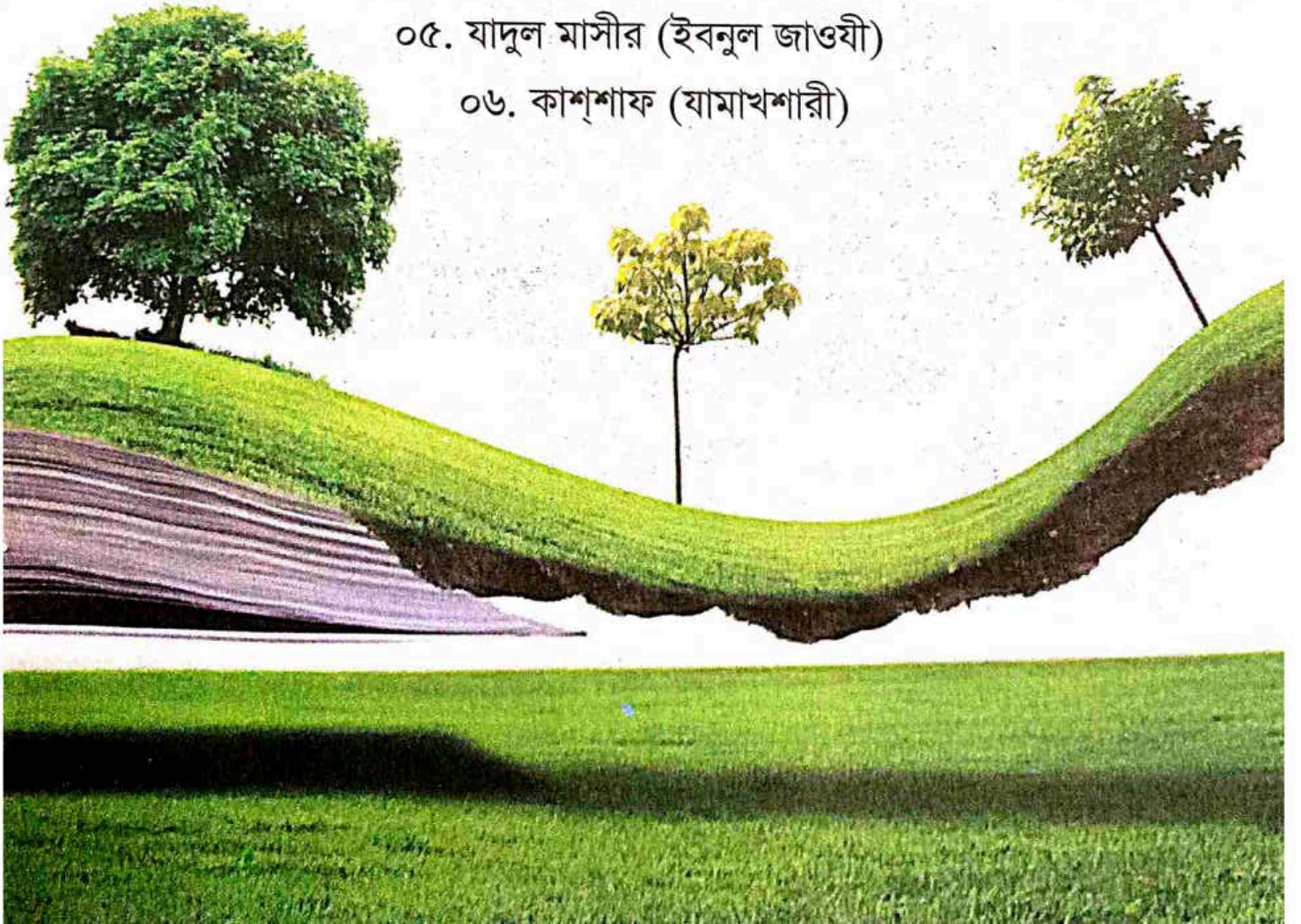
০৭. যিলালুল কুরআন (সাইয়েদ কুতুব শহীদ)

০৮. তাফসীরে কুরতুবী

০৯. ফাতহুল কাদীর (মুহাম্মাদ শাওকানী) [এই কিতাব তিনি সিলেবাসের মধ্যেই পড়ে ফেলেন।

১০. আদ্দুররুল মানসূর

১১. রূহুল মাআনী (আলূসী)

১২. তাফসীরে কাবীর (ফখরুদ্দীন রাযী)

১৩. তাফসীরে সা'দী

১৪. তাফসীরে দূসুরী

১৫. তাফসীরে বাগভী

১৬. তাফসীরে আবদুর রায্যাক
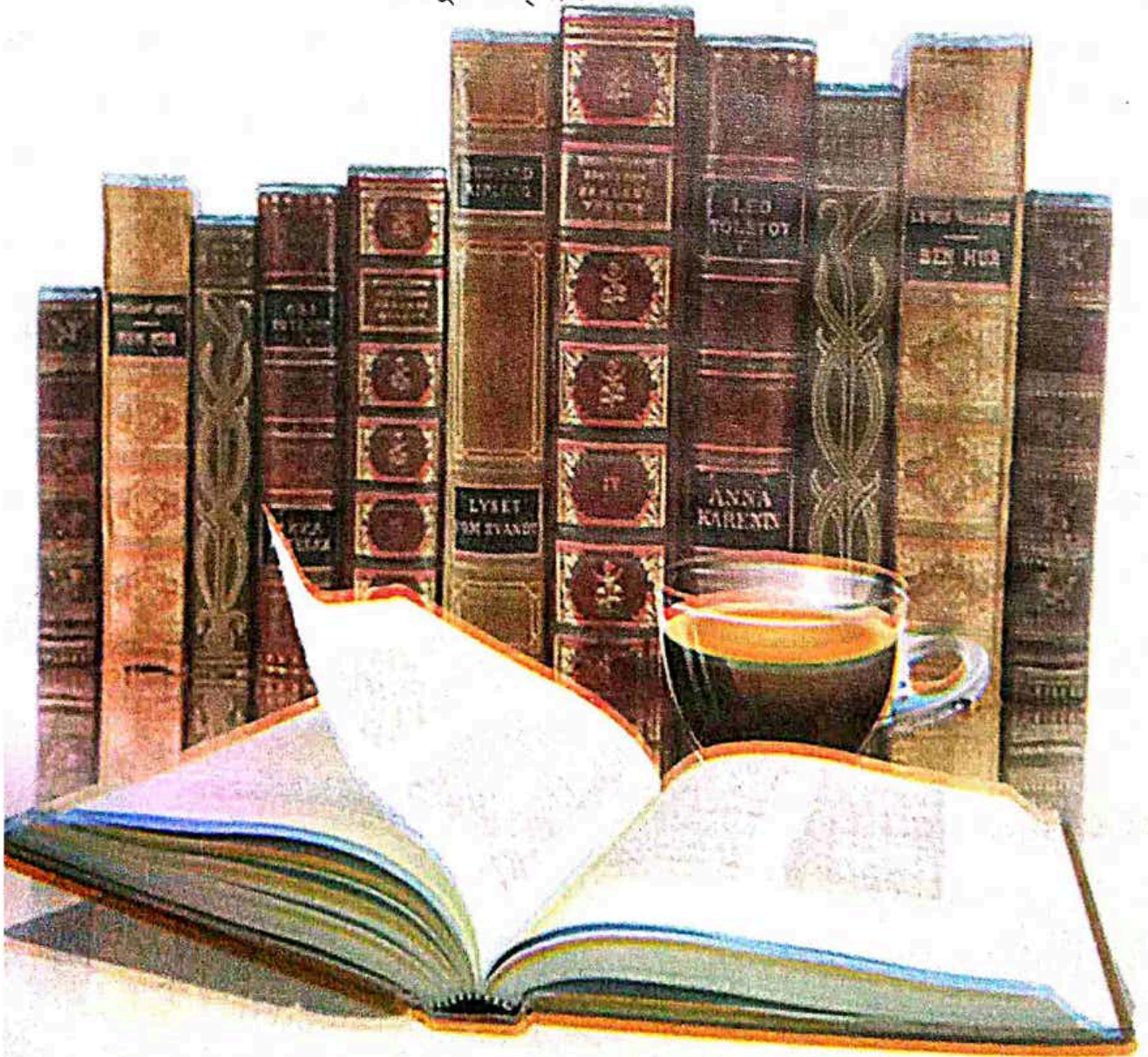
১৭. তাফসীরে মুজাহিদ।

কুরআনের বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি শাস্ত্র আছে। একে উলূমুল কুরআন বলা হয়ে থাকে। উলামায়ে কেরাম এই শাস্ত্রের উপর অনেক কিতাব লিখেছেন। ডক্টর আয়েয আল-করনী এই শাস্ত্রের কয়েকটি গ্রন্থ অধ্যায়ন করেন। যেমন–

০১. আল-বুরহান (যিরিক্লী)

০২. আল-ইতকান ফী উলূলিম কুরআন (সুয়ূতী)

০৩. মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন (মান্না' আলকাত্তান)

হাদীসের গ্রন্থাবলি থেকে তিনি অধ্যয়ন করেন–

০১. বুলূগুল মারাম (ইবনে হাজার আসকালানী) এই কিতাবটি তিনি পঞ্চাশ বারেরও বেশি পড়েন এবং মুখস্থ করে নেন।

০২. উমদাতুল আহকাম

০৩. আল-মুন্তাখাব (নাবাহানী)

০৪. মুখতাসারুল বুখারী (যাবীদী)

০৫. মুখতাসার মুসলিম (মুনযিরী)

০৬. আল-লু'লু' ওয়াল-মারজান [আল-মুন্তাখাব (নাবাহানী), মুখতাসারুল বুখারী (যাবীদী), মুখতাসার মুসলিম (মুনযিরী), আল-লু'লু' ওয়াল-মারজান– এই কিতাবগুলো তিনি অনেকবার করে পড়েছেন।]

০৭. জামিউত তিরমিযী

০৮. মুখতাসার সুনানে আবু দাউদ
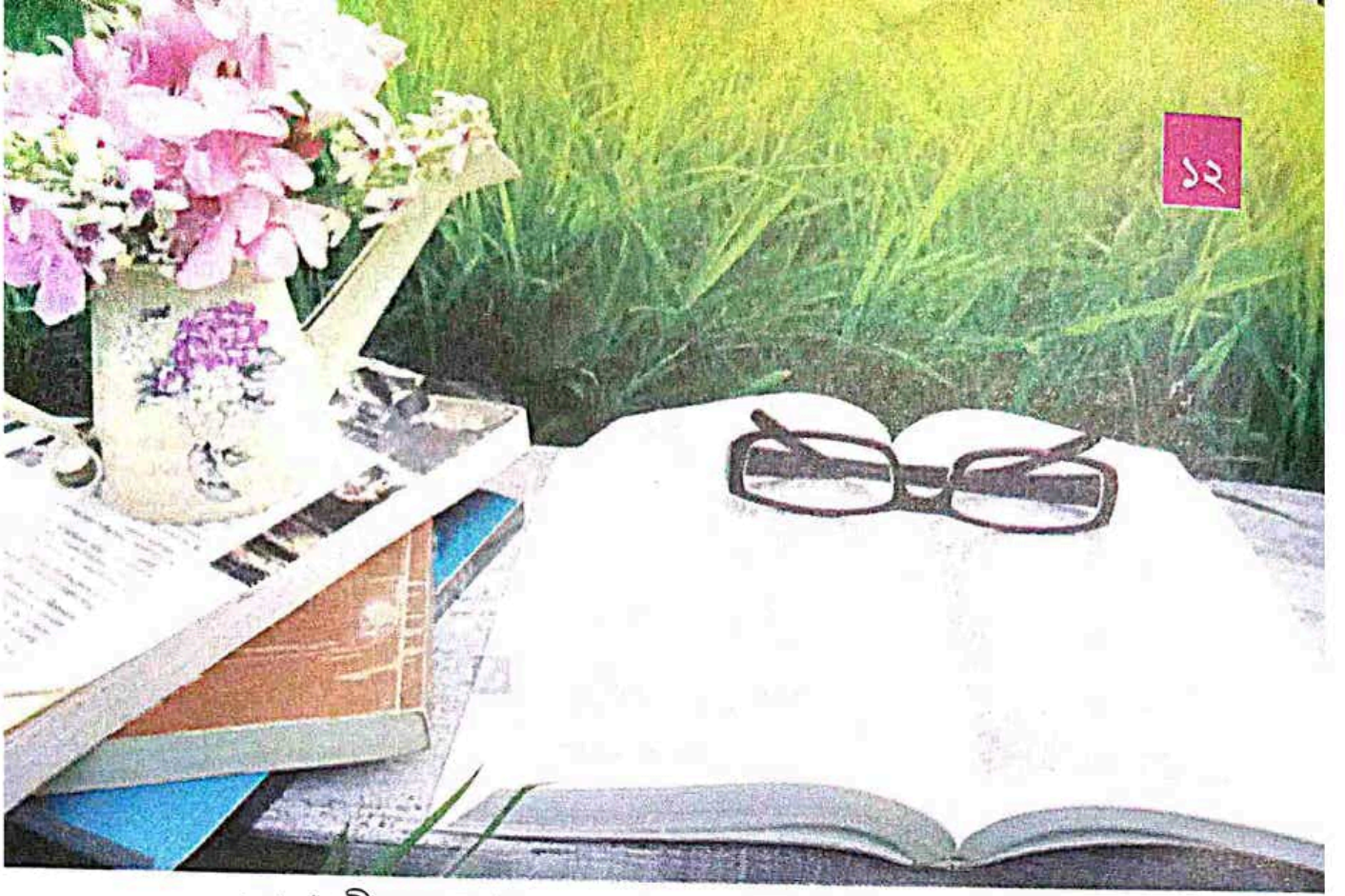
০৯. তাহযীবুস সুনান

১০. মুসনাদে ইমাম আহমাদ

১১. আল-ফাতহুর রব্বানী

১২. রিয়াযুস সালিহীন

১৩. জামিউল উলূম ওয়াল-হিকাম (ইবনে রজব)

১৪. আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব

১৫. মিশকাতুল মাসাবীহ

১৬. ইরওয়াউল গালীল

১৭. সহীহ বুখারী

১৮. সহীহ মুসলিম

১৯. জামেউল উসূল (ইবনুল আসীর)

কোন কোন হাদীসের কিতাব অধ্যয়ন করার সময় উক্ত কিতাবের মশহূর ব্যাখ্যাগ্রন্থও পড়ে নেন। কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম এখানে তুলে ধরা হচ্ছে–

০১. ফাতহুল বারী (ইবনে হাজার)

০২. আল-মিনহাজ (নববী)

০৩.তুহফাতুল আহওয়াযী (মুবারকপুরী)

০৪.মাআলিমুস সুনান (খাত্তাবী)

০৫.উমদাতুল কারী (আইনী)

ফেকাহ'র অনেক কিতাব ডক্টর আয়েয আলকারনী অধ্যয়ন করেন–

০১.আস-সালসাবীল ফী মা'রিফাতিদ দালীল (বালীহী)

০২.যাদুল মুস্তানকি'

০৩.আদ-দুরারুল বাহিয়্যা (মুহাম্মাদ শাওকানী)

০৪.নাইলুল আওতার

০৫.আল-মুগনী (ইবনে কুদামা)

০৬.আল-মুহাল্লা (ইবনে হযম)

০৭.তারহুত তাসরীব [অনেক বার পড়েছেন।]

০৮.ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া

উসূলে ফেকাহর যেসব কিতাব ডক্টর আয়েয আল-কারনী অধ্যয়ন করেন, সেগুলো হচ্ছে–

০১.আররেসালা (ইমাম শাফেয়ী)

০২.আল-মুওয়াফাকাত (শাতেবী)

০৩.আল-লুমা' (শীরাযী)

০৪.আল-মুস্তাস্ফা

আকীদাবিষয়ক কিতাবাদি–

০১.আল-আকীদাতুল ওয়াসিতিয়্যা

০২.আল-আকীদাতুত তাদমুরিয়্যা

০৩.আল-আকীদাতুল হামাবিয়্যা

০৪.লুমআতুল ই'তেকাদ (ইবনে কুদামাহ)

০৫.আল-আকীদাতুত তহাবিয়্যা

০৬.মাআরিজুল কাবূল (হাফেয হাকামী)

০৭.আদ্দীনুল খালেস

০৮. কিতাবুত তাওহীদ (ইবনে খুযায়মা)

সীরাতবিষয়ক গ্রন্থাবলি–

০১.সিয়ারু আ'লামিন নুবালা [পনেরো খণ্ডের এই কিতাব তিনি চার বার পড়েছেন।]

০২.আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া

০৩.তারীখুত তাবারী

০৪.আল-মুন্তাযাম (ইবনুল জাওযী)

০৫.ওয়াফয়িয়াতুল আ'য়ান

০৬.যাদুল মাআদ

যুহ্দসম্পর্কিত কিতাবাদি–

০১.তাযকিরাতুল হুফ্ফায (যাহাবী)

০২.কিতাবুয যুহ্দ (আহমাদ ইবনে হাম্বল)

০৩.কিতাবুয যুহ্দ (ইবনুল মুবারক)

০৪.কিতাবুয যুহ্দ (অকী' ইবনুল জার্রাহ)

০৫.হিলয়াতুল আওলিয়া (আবু নুআইম)

০৬.মাদারিজুস সালিকীন (ইবনুল জাওযী)

০৭.ইয়াহ্য়ায়ু উলূমিদ্দীন (আলগাযালী)

০৮.সিফাতুস সফ্ওয়া (ইবনুল জাওযী)

আদব (সাহিত্য)-এর কিতাবাদি–

০১.আল-ইকদুল ফরীদ

০২.উয়ূনুল আখবার

০৩.উন্সুল মাজালিস

০৪.রওযাতুল উকালা

০৫.আল-আগানী

কিছু কিছু মহামনীষীর লেখা বেশিরভাগ কিতাব ডক্টর আয়েয আলকারনী পড়েছেন। তাঁদের কয়েক জনের নাম এখানে উল্লেখ করছি।

[উল্লেখ্য, এসব মহামনীষীর কেউ কেউ এই পরিমাণ গ্রন্থ লিখে গেছেন যে, একজনের সমুদয় গ্রন্থ একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আজকাল ছাপানোর সাহস পায় না।]

* শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া

* ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া
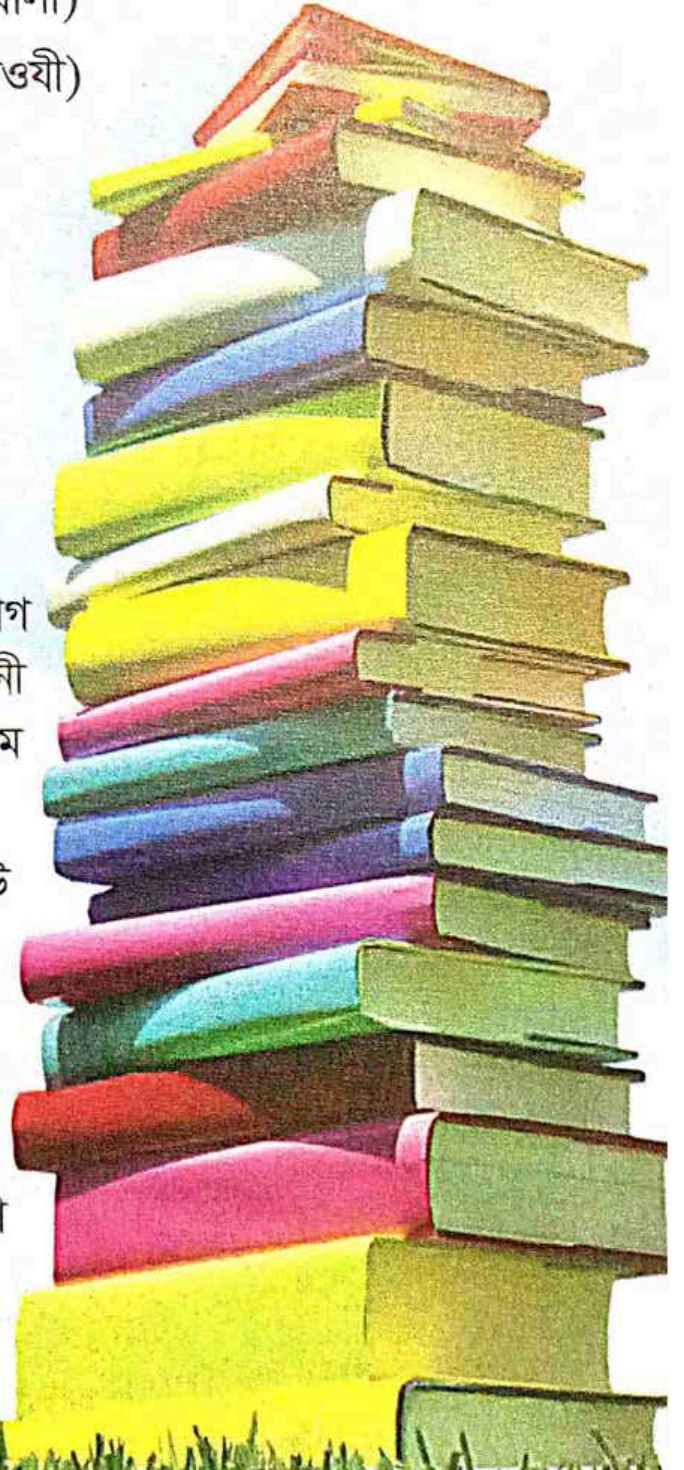
* মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
* শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব তামীমী
* আবুল আ'লা মওদুদী
* আবুল হাসান আলী নদভী
* সাইয়েদ কুতুব (শহীদ)
* মুহাম্মাদ কুতুব
* আবদুল আযীয ইবনে বায
* মুহাম্মাদ আল-উসাইমীন
* ইবনে জাবরীন
* আলগাযালী

[গাযালী'র কিতাবাদিতে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি আছে, ইনসাফের সাথে সেগুলোর সমালোচনা করে ডক্টর আয়েয আল-কারনী কিতাব লিখেছেন।]

ডক্টর আয়েয আল-কারনী একজন কবি। কবিতার সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। আরব-অনারব কবিদের অনেকের কবিতা-সংকলন তিনি অধ্যয়ন করেছেন। শত শত কবিতা মুখস্থ করেছেন।

প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প ইত্যাদি যা পড়েছেন, সেগুলোর সংখ্যাশুমার করা মুশকিল।
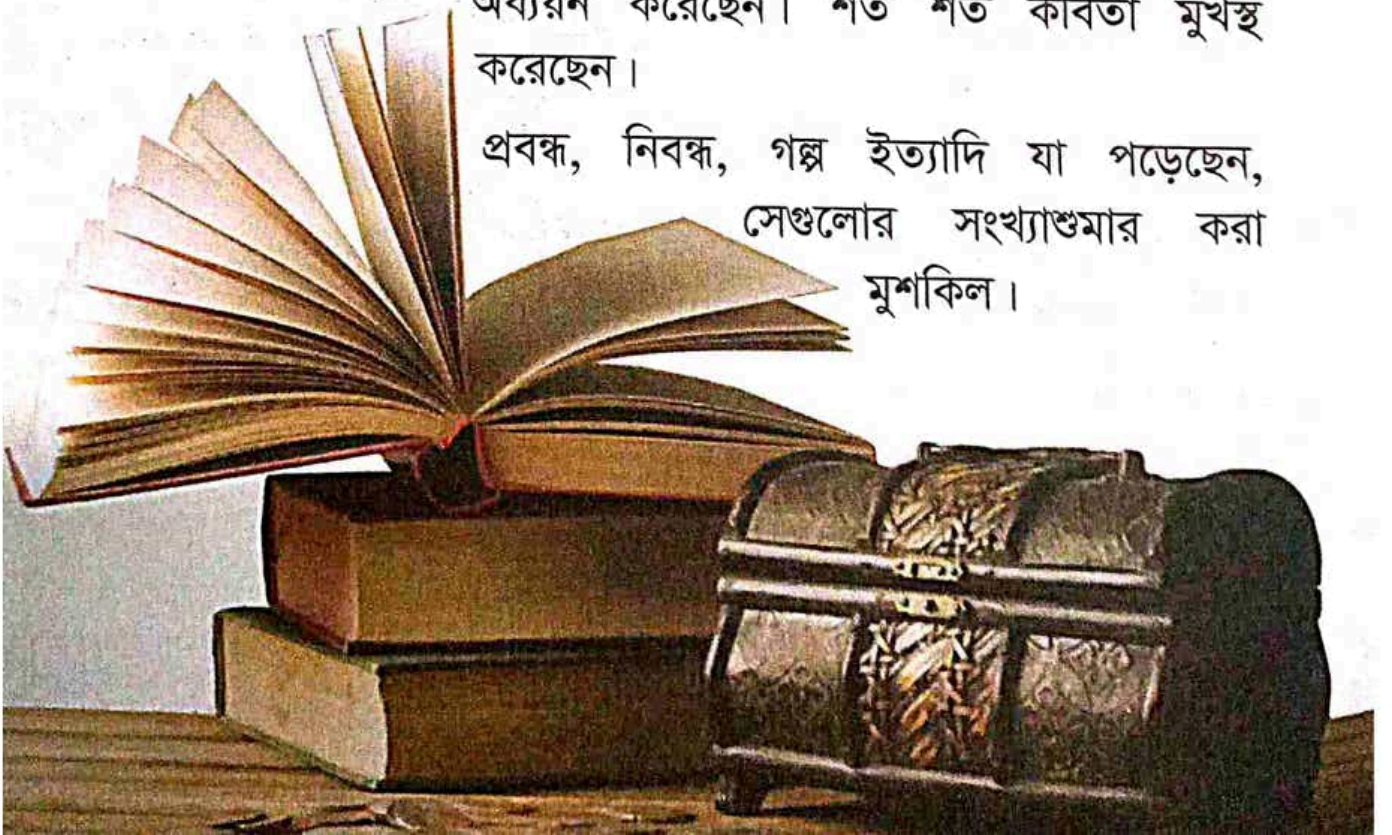
ড. আয়েয আল-কারনীর প্রধান কাজ দাওয়াত ইলাল্লাহ। মসজিদ, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সংস্থার সেমিনার ও মাহফিলে তিনি বক্তৃতা করে থাকেন। তাঁর বক্তৃতার ক্যাসেটের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

ইন্টারনেটের অধীন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার, গুগ্‌লপ্লাস ও ইউটিউব ইত্যাদিতেও তিনি তুমুলভাবে সক্রিয়। ২০১৭ সালের শুরুর দিকে শুধু ফেসবুকেই তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা ছিল এক কোটি ছাপ্পান্ন লাখ।

ড. আয়েয এ পর্যন্ত আশি'রও অধিক গ্রন্থ লিখেছেন। সেগুলোর মধ্যে 'লা তাহযান, আত-তাফসীরুল মুয়াস্‌সার, আস্‌আদুম্‌রাতিন ফিল-আলাম, আল-ফিকহুল মুয়াস্‌সার, আশেক, হাদায়িকু যাতু বাহযাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম মুহাম্মাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সাত বছর হাদীসের উপর অধ্যাপনা করেছেন। এখন দাওয়াতের কাজের জন্য অবসর।

বর্তমানে তিনি ইমাম মুহাম্মাদ জামে মসজিদের খতীব।

তথ্যসুত্র : اَلْمُعْجَمُ الْجَامِعُ فِيْ تَرَاجِمِ الْعُلَمَاءِ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ الْمُعَاصِرِيْنَ
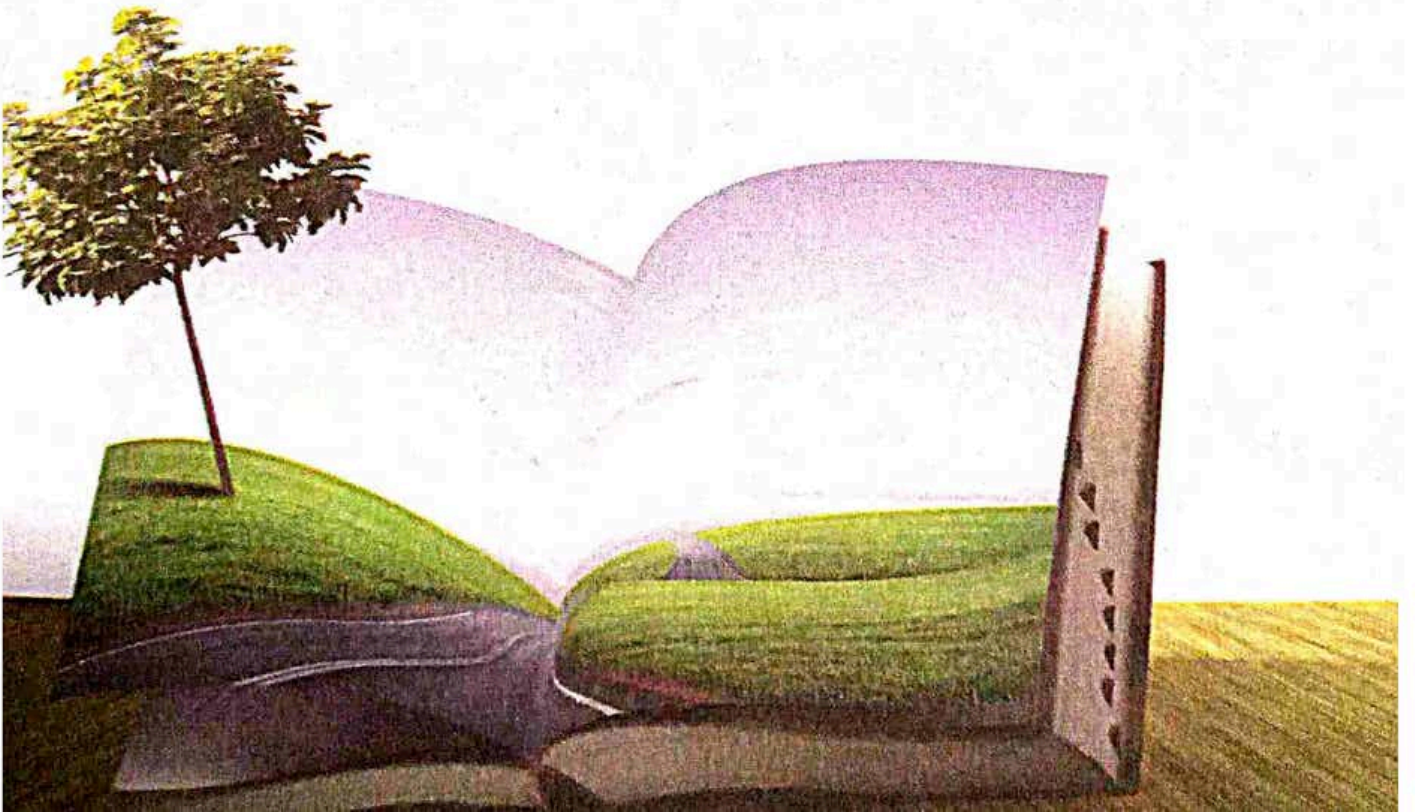
‘লা তাহযান’ সম্পর্কে আমার অভিব্যক্তি

কিছু কিছু গ্রন্থ নির্দিষ্ট কালে রচিত হলেও, কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের কাছে তা সমাদৃত হতে থাকে। যেমন, মহাকবি ফেরদৌসীর শাহনামা, মুতানাব্বীর দিওয়ান, হারীরীর মাকামাত, শেখ সাদীর গোলেস্তাঁ, ইকবালের শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া, ম্যাক্সিম গোর্কীর মা, তলস্তয়ের ওয়ার এন্ড পীস ইত্যাদি। এসব গ্রন্থ বহুদিন আগে রচিত হলেও আজ পর্যন্ত এগুলোর আবেদনে কোন ভাটা পড়েনি।

এই তালিকায় আধুনিক কালে যোগ হয়েছে সৌদী আরবের প্রখ্যাত আলেম, বিশিষ্ট লেখক গবেষক ও কবি ড. আয়েয আলকারনীর ‘লা তাহ্যান’। আমার ধারণা এই গ্রন্থটির আবেদনও বহুদিন অব্যাহত থাকবে।

১৭ জুমাদাল উলা, ৩৬ হি. (০৯/০৩/১৫ ইং) তারিখে বইটি খরিদ করার সৌভাগ্য হয় আমার। তারপর সারা দিনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে বইটি পড়তে থাকি। ০৮ জুমাদাস সানিয়া, ১৪৩৬ হিজরী, (২৯/০৩/১৫ ইং) রবিবার পড়া শেষ হয়। অধ্যয়ন শেষ করে নিজের ভিতরে বেশ পুলক অনুভব করি। এজন্য বিলম্ব না করে পাঠপ্রতিক্রিয়া হিসেবে কয়েকটি কথা লিখে ফেলি। এখন সে কথাগুলোই কিছুটা
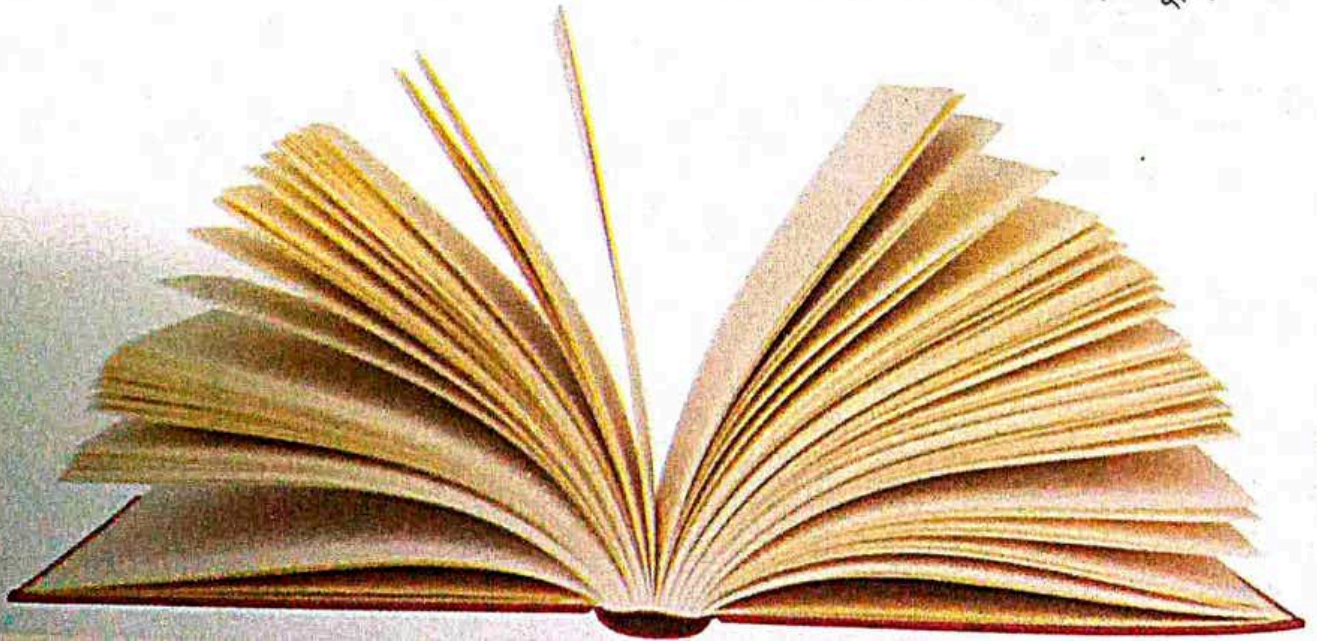
পরিমার্জন করে পাঠকের সামনে তুলে ধরছি।

'লা তাহ্যান' গ্রন্থটির কলেবর বেশ বড়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৭৯।

আমি যে কপিটি খরিদ করেছি, সেটি বইটির সপ্তবিংশ মুদ্রণের অন্তর্ভুক্ত। এই সংস্করণটি মুদ্রিত হয়েছে ১৪৩৫ হি. (২০১৪ ইং) সনে। প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা 'ওবাইকান' বইটি প্রকাশ করেছে। বইটির মলাটের গায়ে লেখা আছে 'এই কিতাবটি ১০ মিলিয়নেরও অধিক কপি মুদ্রিত হয়েছে; ত্রিশটিরও অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।'

লেখক সম্পর্কে অনেকটা অবগতি আমার আগে থেকেই ছিল। তা ছাড়া 'লা তাহ্যানে'র সুনামও আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। পড়তে গিয়েও আকর্ষণ ম্লান হয়নি। বরাবরই আকর্ষণ বোধ করেছি। লেখকের পড়াশুনা যে অত্যধিক বেশি, সে কথা বইটি ছতরে ছতরে ধরা পড়ে।

পাঠকের হতাশা দূর করার জন্য লেখক বইটি লিখেছেন। আমিও বিশ্বাস করি, বইটি যদি কেউ নিয়মিত অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত করে, তা হলে তার হতাশা পুরোপুরিই দূর হয়ে যাবে। লেখক অধিক হারে কুরআন মাজীদের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। বেশিরভাগ দাবির উপর তিনি আয়াত পেশ করে দলিল দিতে চেষ্টা করেছেন। বিষয়টি লেখককে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। এতে আমি বেশ ঈর্ষা বোধ করেছি।

সাধারণ নিয়ম ছাপিয়ে লেখক অতি সংক্ষেপে হাদীস উল্লেখ করেছেন। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে নিজের কথার তালে তালে হাদীসের এবারত এঁটে দিয়েছেন। এতেও অ্যাডভান্স পাঠক বেশ পুলক অনুভব করার কথা। হাদীসের সনদ উল্লেখ না করে বইটির পাঠপরিক্রমায় যে কোমলতা সৃষ্টি হয়েছে, তাও বেশ উপভোগ করার মত।

লেখকের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি কথায় কথায় পূর্ববর্তী বুযুর্গ আলেমদের জীবনচরিত থেকে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা তো দেদার উল্লেখ করেছেন। তবে আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইবনে তাইমিয়া, ইমাম শাফেয়ী, ইবনুল কায়্যিম, ইবনুল জাওযীকে খুব বেশি উদ্ধৃত করেছেন।

প্লেটো, আব্রাহাম লিংকন, নেপোলিয়ন, ডেলকার্নেগী, শেক্সপিয়ার, তলস্তয়, মহাত্মা গান্ধী, কালীদাসসহ অনেক অমুসলিম নামকরা লোকদের কথাও উঠে এসেছে এই গ্রন্থে।

ডক্টর আয়েয একজন কবি। এজন্য তিনি যেমনই নিজের কবিতা উল্লেখ করেছেন; তেমনই উল্লেখ করেছেন বহু আরব কবির কবিতা। তাদের মধ্যে মুতানাব্বী, হাতেম তায়ী, হাস্সান ইবনে সাবেত, আবু মাযী, আবু তাম্মাম, লাবীদ, আবুল আতাহিয়্যা, ইবনে মুবারক, ইবনে আব্বাস প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। লেখক ইকবালের কবিতাও কখনও কখনও উদ্ধৃত করেছেন।
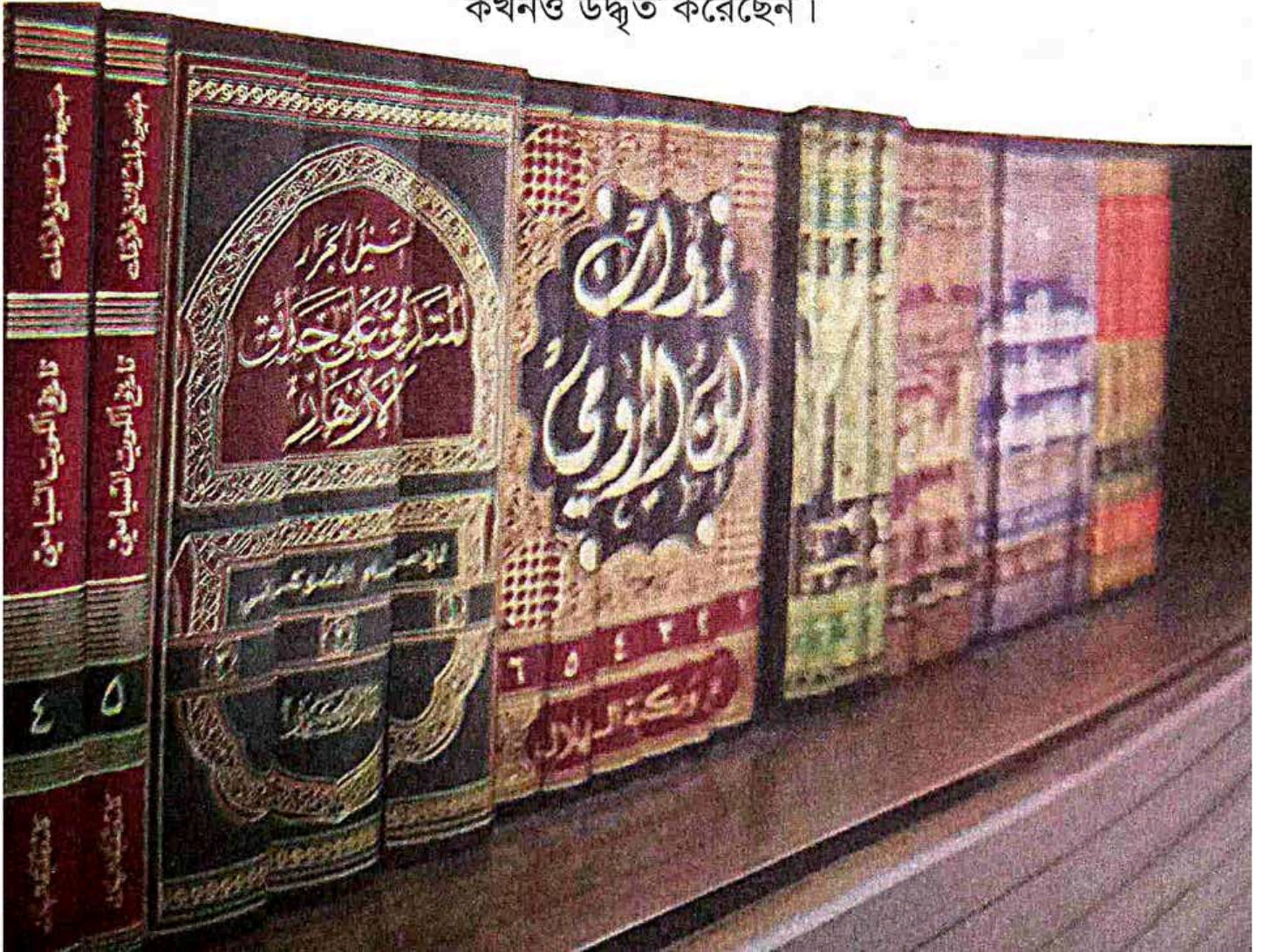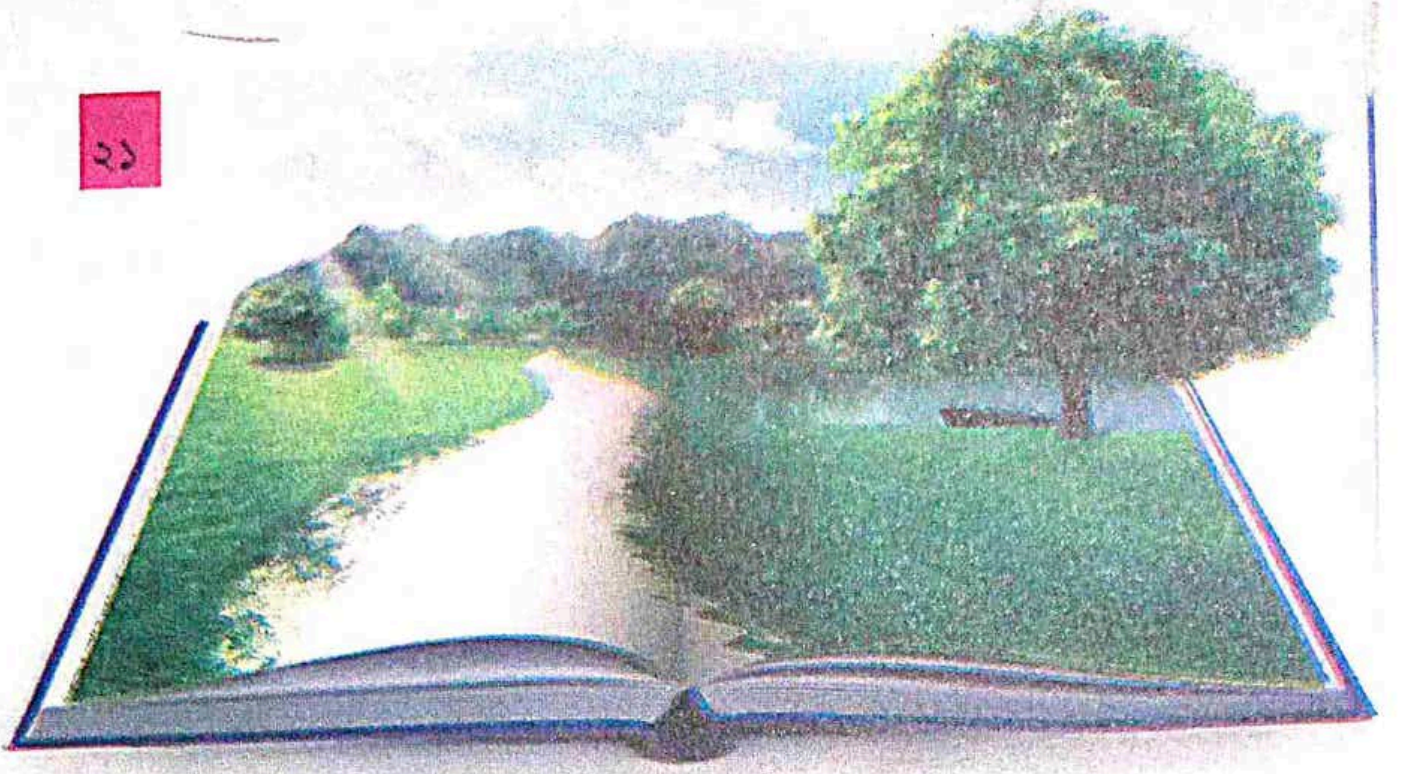
গ্রন্থখানার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে হতাশা পরিহার করা। পড়তে গিয়ে প্রতি ছতরেই আমি লেখকের ইখলাস অনুভব করেছি। বাকি আমি তো তাঁর বুক চিরে দেখতে পারব না, এজন্য এক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাক্ষ্য দেওয়া মুশকিল।

বইটি বারবার পাঠ করা জরুরী। আমার নিয়ত আছে আরও কয়েক বার খতম করার। এই বইটি কাউকে ধার দেওয়ারও আমার ইচ্ছা নেই। কারও যদি পড়তে মন চায়, তা হলে বাজার থেকে সংগ্রহ করে আজই পড়া শুরু করা উচিত। কেননা, লেখকও যেকোন কাজ আজই করে ফেলতে বলেছেন। আগামী কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার কী নিশ্চয়তা আছে?

বিনীত
আপনার ভালোবাসার ভিখারী
মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

আমি যেভাবে পড়তাম

ড. আয়েয আল করনী

যখন আমার শৈশব ও খেলাধুলার বয়স শেষ হল, তখন কিতাবপত্রকে সাথি, সঙ্গী ও বন্ধু বানিয়ে নিলাম। ভোরে ঘুম থেকে উঠি, তখনও কিতাব আমার সঙ্গী। সন্ধ্যা হয়, তখনও কিতাব আমার বন্ধু। ঘুমাই কিতাব বুকে নিয়ে। হাঁটতে থাকি, কিতাব হাতে নিয়ে। কিতাবের জন্য পরিবার ও ভাইবেরাদর ছেড়ে দিলাম। বন্ধুবান্ধব বাদ দিয়ে ব্যস্ত হলাম কিতাব নিয়ে। এ কারণে পার্কের আনন্দ-ভ্রমণও বর্জন করলাম।

এমন এক যামানা আমার অতিবাহিত হয়েছে যে, অধ্যয়নের কারণে আমি বাড়ি থেকে বের হতাম না। কিছু দিন খাওয়া-দাওয়ার সময়ও পড়তাম। খেতাম, পড়তাম। হাঁটতাম, পড়তাম। বন্ধুরা ঘুরে বেড়াত, আমি পড়তাম। লোকজনের জমায়েত, তাদের আনন্দ-উল্লাস দেখতাম; কিন্তু আমি কিতাব নিয়ে ব্যস্ত; পাতা ওলটানোয় লিপ্ত। দিনে প্রায় দুইশ পৃষ্ঠা পড়তাম। কখনও সারা দিনে পড়ে ফেলতাম পুরো একটি খণ্ড। কখনও একটি পৃষ্ঠা দশ বার পড়তাম। গদ্যের একটি প্যারা পড়তে পড়তে মুখস্থ করে ফেলতাম। কখনও মুখস্থ করতাম পুরো কাসীদা।

তাফসীর পড়তে পড়তে বিরক্ত হয়ে গেলে শুরু করতাম ফেকাহ্। পড়তাম ক্লান্ত হওয়া পর্যন্ত। তারপর সাহিত্য পড়তাম ত্যাক্ত হওয়া পর্যন্ত। এরপর হাদীস মুখস্থ করতাম; কুরআন তেলাওয়াত করতাম। জীবনী অধ্যয়ন করতাম। কবিতা আবৃত্তি করতাম। কখনও কখনও লিখতাম; সংক্ষেপ করতাম; কাটছাঁট করতাম; সম্প্রসারণ করতাম। কোন কোন কিতাব আমি দশ বার পড়েছি। অনেক মৌলিক গ্রন্থের সারাংশ বের করেছি।

কিতাব সাথে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতাম। তারপর কোন আওয়াজ শুনেও উঠতাম না; কোন লোক দেখেও না। কেননা, আমি থাকতাম মহাতৃপ্তিতে, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় স্বাদে।

সপ্তাহের একেক দিনের জন্য আমি একেক বিষয় নির্দিষ্ট করেছিলাম। যেমন, শনিবার আকীদার জন্য; রবিবার ফেকাহ্র জন্য; সোমবার তাফসীরের জন্য; মঙ্গলবার হাদীসের জন্য; বুধবার ব্যাকরণের জন্য; বৃহস্পতিবার আদবের [আরবীসাহিত্যের] জন্য; শুক্রবার সীরাতের জন্য।

কখনও কখনও পড়তে পড়তে ফজর পর্যন্ত জাগ্রত থাকতাম। এমন কত ঈদ অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমার হাতে কিতাব থাকত। অনেক সময় আমার বন্ধু গাড়ি চালাত, আমি গাড়িতে বসে পড়তে থাকতাম। এরপর যখন আমি গাড়ি চালাতাম, তখন তাঁকে বলতাম (জোরে

জোরে) পড়তে। কিতাবের বড় ভলিউম হলে সেটা অনেকগুলো ভাগে ভাগ করতাম। এরপর একেক ভাগ বার বার করে পড়তাম।

একটি বইয়ের কয়েকটি কপি কিনতাম। একটি কপি রাখতাম মজলিসে। আরেকটি ঘুমের কামরায়। আরেকটি আমার সঙ্গে গাড়িতে। খাবার উপস্থিত হয়ে গেলে কোন বন্ধুকে বলতাম পড়ে শোনাতে। একেকটি গ্রন্থ বারবার পড়ার কারণে সে গ্রন্থের কোথায় শিরোনাম, কোথায় কবিতা– তা কি ডানের পৃষ্ঠায় না কি বামের পৃষ্ঠায়– এগুলো আমার জানা থাকত।

কিতাব হাতে নিয়ে রাত জাগরণ করতাম। ঝিমুনি এলে হাত থেকে কিতাব পড়ে যেত। আমি গা ঝাড়া দিয়ে আবার পড়তে শুরু করতাম। এভাবে কতবার হাত থেকে পড়ে যেত। একসময় কিতাব পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়তাম। কখনও কখনও লোকজন আমার পাশে কথাবার্তা বলত। আমি পড়তে থাকতাম। এজন্য আমি বুঝতাম না তারা কি বলত।

যারা পড়ত না, তাদের জন্য আশ্চর্য হতাম। আমার মনে হত তাদের জীবনে নতুন কিছু নেই। ব্যয়াম, কুস্তি বা ভ্রমণ– এমন কোন শখ আমার ছিল না। আমার শখ আর সম্পর্ক ছিল শুধু কিতাবকে ঘিরে। কিতাব ছিল আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমার সাথে কিতাবের সাথে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। কিতাবাদির মধ্যে কিছু আছে দরকারী। যেমন, ইলমসংক্রান্ত
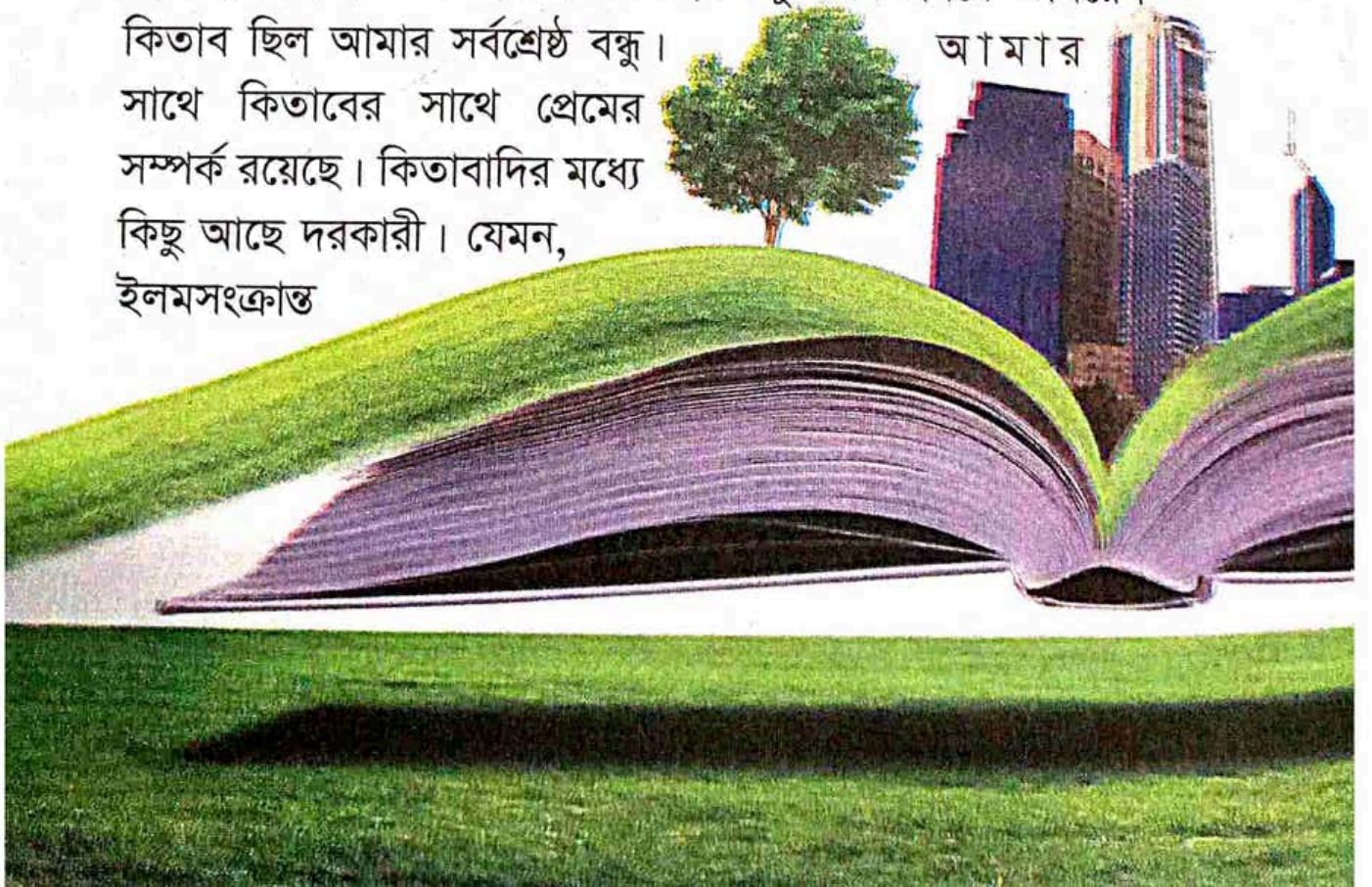
কিতাবসমূহ। কিছু আছে আনন্দের। যেমন, আদবের বইপুস্তক। কিতাব ছাড়া খাবার খাওয়ার ধৈর্যও আমার আসে না। আমি বিভিন্ন প্রকারের কিতাব পড়তে ভালোবাসি।

আমার আসক্তি আর নেশা হচ্ছে কিতাব কেনা ও সংগ্রহ করা। এক্ষেত্রে আমি দেদারসে পয়সা খরচ করি। কখনও করজ গ্রহণ করি। কোথাও গেলে সেখানকার লাইব্রেরী ও গ্রন্থাগার খুঁজে বের করি। আমি আশ্চর্য হতাম পূর্ববর্তীদের রচনা ও সংকলনের হিম্মত দেখে। তাজ্জব হতাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়িম, ইবনে জাওযী, যুহরী, তাবারী, ইবনে হাজার ও ইবনে কাসীর প্রমুখের রচনাসম্ভার দেখে।

নতুন কোন কিতাব সংগ্রহ করতে পারলে আমি যারপরনাই খুশি হই। অনেক সময় কিতাবের মধ্যে আমি একেবারে নিবদ্ধ হয়ে যেতাম। কখনও আমার গ্রন্থাগারে রাত জেগে পড়তে থাকতাম। একসময় বইপুস্তকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়তাম।

একবার আমি গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তখন আমি মসজিদে যাওয়া ছাড়া আর কোন কাজে বাড়ি থেকে বের হইনি। ফজরের পর থেকে সাতটা পর্যন্ত পড়তাম। এরপর নয়টা পর্যন্ত ঘুমাতাম। এরপর যোহর পর্যন্ত পড়তাম।

তারপর বিশ্রাম পর্যন্ত। আবার পড়তাম আসরের পরে, মাগরিবের পরে, এশার পরে– ঘুমানো পর্যন্ত। খাবার উপস্থিত হত, আমি পড়তেই থাকতাম। বাবার সাথে বসেও আমি পড়তে থাকতাম। চোখ নষ্ট হওয়ার ভয়ে বন্ধুরা আমাকে পড়া কমিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আমি পড়া বর্জনের ধৈর্য ধরতে পারলাম না। বরং পড়ার প্রতি আমার তৃষ্ণা আরও বেড়ে গেল।

আলেমদের পড়াশুনা ও ইলম অর্জন সংক্রান্ত বইপুস্তকের অধ্যয়ন আমার পড়ার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিত। এক্ষেত্রে আবু গুদ্দাহ'র 'সাফাহাত মিন সাব্‌রিল উলামা', ইবনে জাওযী'র 'সায়দুল খাতির', বাগদাদী'র 'আল-ফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ' ও শাওকানী'র 'নায়লুল আরাব' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
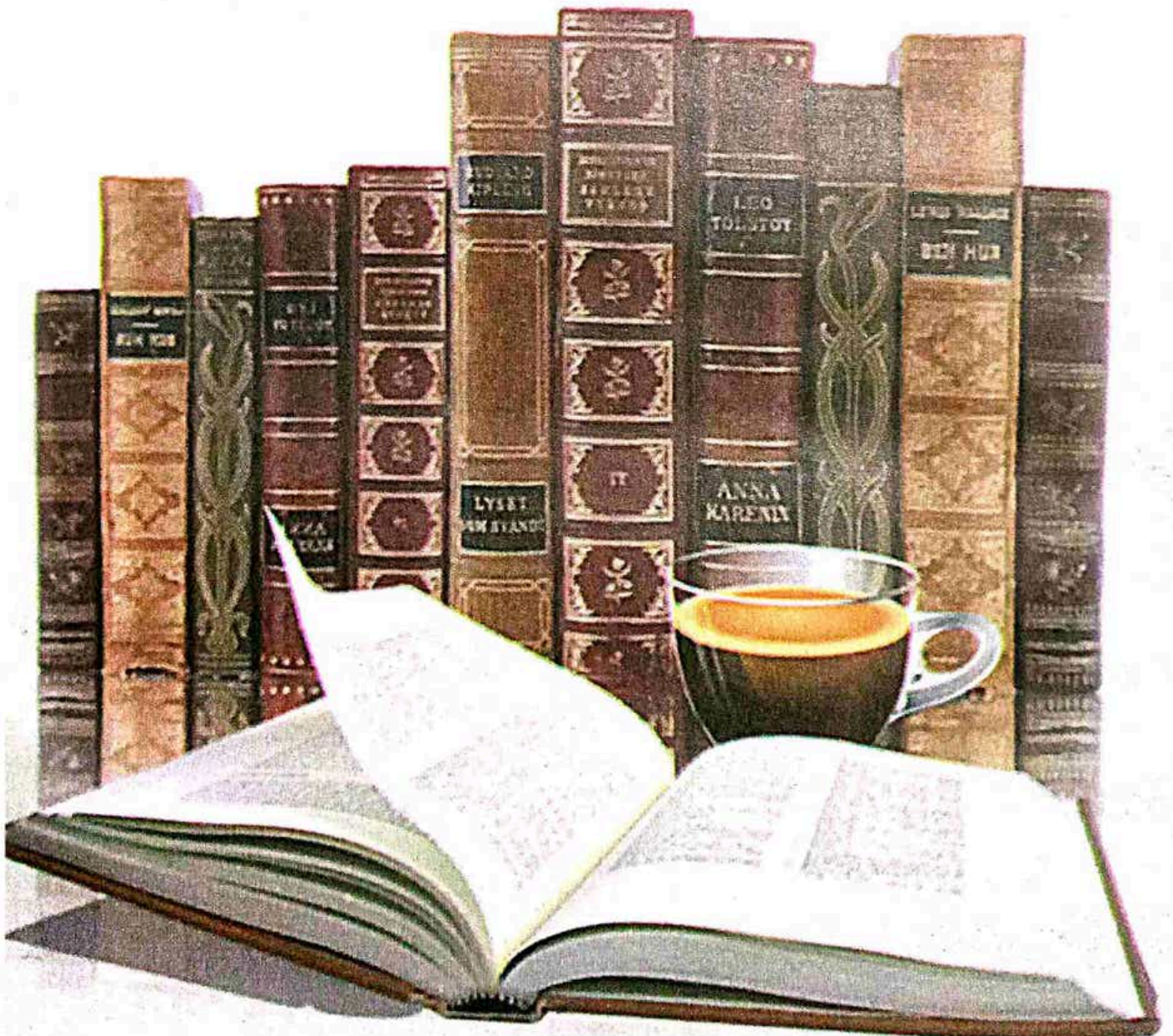
'ফাতহুল বারী'র একেকটি পৃষ্ঠা আমি তিনবার পড়তাম। যখন আমি কোন কিতাব পড়তাম এবং সেটা ভালো লাগত, তখন মনে হত কিতাবটি আরও দীর্ঘ হলে এবং আরও কিছু পৃষ্ঠা থাকলে ভালো হত। শুধু জাহেযের কিতাবাদির জন্য, শুধু ইবনে তাইমিয়ার কিতাবাদির জন্য, শুধু ইবনে হযমের কিতাবাদির জন্য কিছু কিছু করে দিন নির্দিষ্ট করেছিলাম। এতে দিলের মধ্যে এমন তীব্র আগ্রহ আর বইপুস্তকের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমার সঙ্গে কিতাব না থাকলে বিরক্তি, ভীতি ও ব্যথা অনুভব করি। অনেক সময় বন্ধুরা আমাকে ধরেবেঁধে পিকনিকে নিয়ে যেতেন। আমি সঙ্গে কিতাব নিয়ে যেতাম। সেখানে গিয়ে যদি পড়ার সুযোগ না পেতাম, তা হলে পড়ার জন্য বাড়িতে ফিরে আসতাম।

আমি সবই অধ্যয়ন করি। ছোট-বড়, দরকারী-অদরকারী, রচনা-সংকলন, পত্র-পত্রিকা, নতুন-পুরান– সবই। ইলম, আদব ও কৃষ্টিবিষয়ক পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের রচনাবলি, যেকোন অধ্যায়ের হোক না কেন– আমি সব অধ্যয়ন করি। একবার চেষ্টা করেছিলাম নিজের জন্য কিছু বিষয় নির্দিষ্ট করতে; কিন্তু মন তা মানল না।

যখন আমার প্রত্যয় দুর্বল হয়ে যায়, দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তিবর্গের জীবনী অধ্যয়ন করি, তখন আমার মস্তিষ্কে প্রত্যয়ের এলহাম হয়; অন্তরে পড়া-শুনার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। তারপর আমি পড়তে থাকি, মুখস্থ করতে থাকি, লিখতে থাকি, সারাংশ বের করতে থাকি।
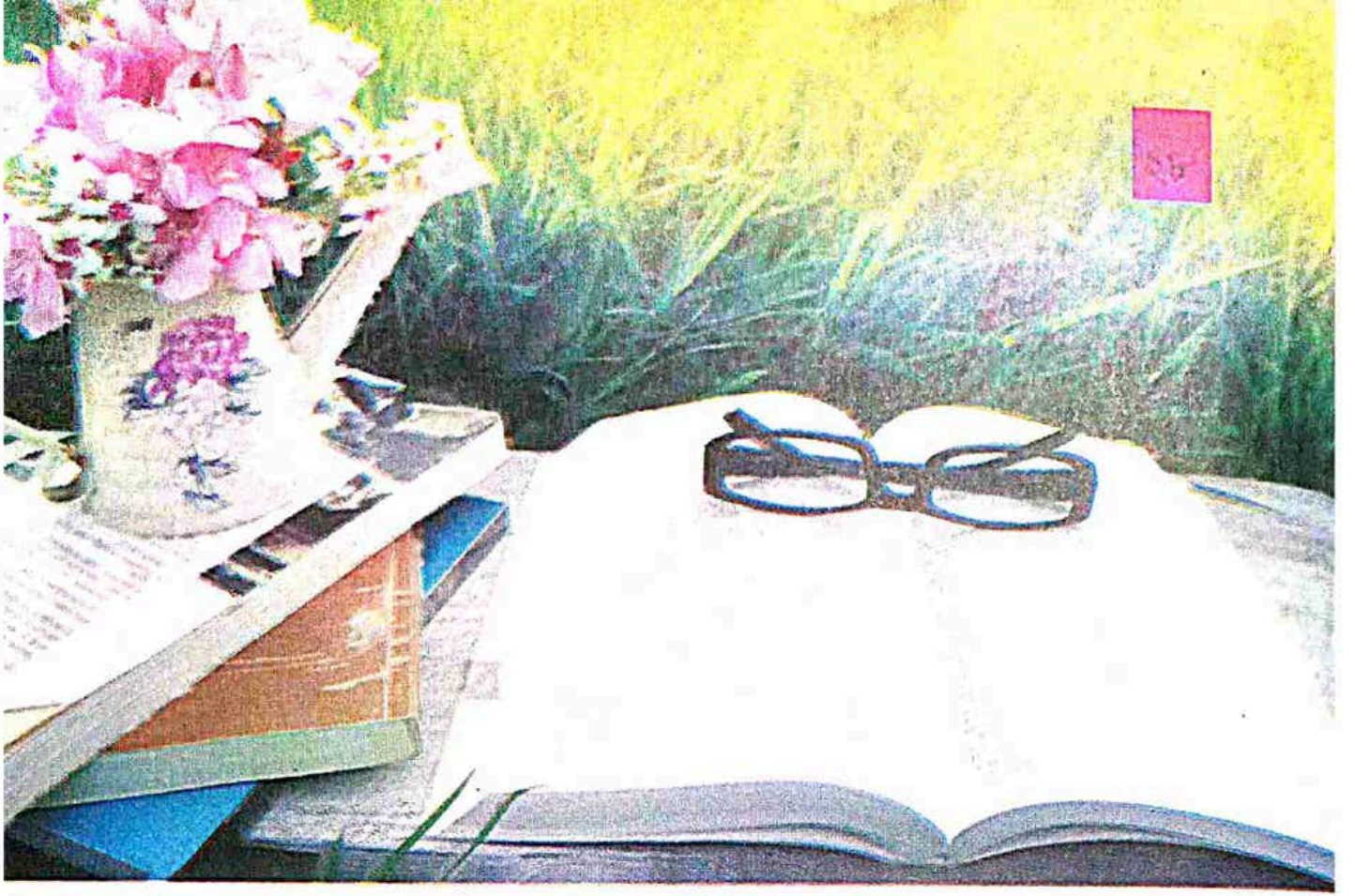
যেসব গ্রন্থ-পুস্তক আমি অধ্যয়ন করেছি, সেগুলোর নাম এবং সেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট স্মৃতিকথা লিখি, তা হলে একটি গ্রন্থরূপ লাভ করবে। আমি তাজ্জব হই বাজারে বসে যারা অবসর সময় কাটায়, অথবা খেলা দেখে, কিংবা খেলা নিয়ে গল্পে মত্ত হয়, তাদের ব্যাপারে। কীভাবে তারা পড়াশুনার স্বাদ, আর অধ্যয়নের তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত।

এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার বহু দেশ আমি সফর করেছি। তখনও আমার সিথানে, আমার বুকে, আমার সামনে বইপুস্তক রাখতাম। পড়াশুনার প্রতি পশ্চিমাদের সীমাহীন আগ্রহ আর আরবদের সীমাহীন অনীহা দেখে আমি আশ্চর্যবোধ করি। এটাই পশ্চিমাদের উন্নতি, অগ্রগতির মূল কারণ। হায়রে আফসোস আমার কওম– আরব সম্প্রদায়ের জন্য। কেন যে তারা পড়তে পছন্দ করে না? আমাদের ব্যাপারে প্রয়াত মুশি ডায়ান বলেছেন, আরব জাতি পড়াশুনা করে না।

বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থপুস্তক যারা ভালোবাসতেন, কিতাবাদির প্রেমের আগুনে যারা দগ্ধ হতেন, তাদের গল্প আমি অনেক অধ্যয়ন করেছি। প্রেমাসক্ত হওয়ার মত গ্রন্থাবলির মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে আল্লাহর মহান কিতাব কুরআন করীম। এই গ্রন্থের তেলাওয়াত, হিফ্য,

গবেষণা, তাফসীর ও অন্যান্য লিপ্ততার অনন্য কাহিনীমালা বড়রা লিখে গেছেন। স্পেনের একজন সহীহ বুখারী সাতশত বার অধ্যয়ন করেছিলেন। আল্লামা নিশাপুরী সহীহ মুসলিম পড়েছিলেন একশত বার। মুযানী ইমাম শাফেয়ী'র 'রিসালা' নামক গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেছিলেন পাঁচশত বার। পূর্ববর্তীদের কিতাব সংগ্রহ আর কিতাবের সাথে তাদের সম্পর্কের এমন গল্প এত অধিক যে, তা সংখ্যাবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

কিতাবের সাথে এভাবে সময় কাটিয়েছি ত্রিশটি বছর। তবে তা এত সুন্দর, এত চমকপ্রদ আর এত মজাদার ছিল যে, মনে হয় যেন মাত্র ত্রিশ মিনিট।

কখনও আমার কিতাব হচ্ছে কুরআন করীম। এই মহান গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা করি; মুখস্থ করি; এর বিস্ময় দেখে থমকে থাকি। কখনও সময় অতিবাহিত করি তাফসীরের সঙ্গে। বিভিন্ন তাফসীরের পাতা ওল্টাতে থাকি। মুফাস্‌সিরদের মতপার্থক্য, তাদের বিতর্ক, তাদের গবেষণার ধরণ, তাদের উপলব্ধির সুক্ষ্মতা এবং তাদের নিজ মতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কৌশল দেখে মুগ্ধ হতে থাকি।

কখনও অধ্যয়ন করি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস। অনুধাবন করি হাদীসের বর্ণনা ও তত্ত্ব; সনদ ও মতন; বাক্য ও ব্যাখ্যা। তৃপ্ত হতে থাকি মুহাদ্দিসদের স্বাতন্ত্র্য আর বর্ণনাকারীদের কণ্ঠমাল্য থেকে।

কখনও অবতরণ করি আরবী ভাষার উজ্জ্বল ও প্রশস্ত আঙিনায়। প্রবেশ করি এই ভাষার তত্ত্ব ও তথ্যের ভাণ্ডারে। কখনও সময় অতিবাহিত করি আরবী ব্যাকরণের সঙ্গে। এর নীতিমালা ও উপমা এবং ব্যাকরণবিদদের বক্তব্য নিয়ে ভাবি।

কখনও সাঁতরাতে থাকি আরবী সাহিত্যের মহাসাগরে। পদ্য হোক অথবা গদ্য, গল্প হোক অথবা বিবরণ, বিশুদ্ধ হোক অথবা অশুদ্ধ। এর মধ্যে পেয়ে যাই আমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু– অনুভূতির জাগরণ, বিবেকের ফসল এবং মেধার খোরাক। কখনও পাঠ করি ইতিহাস ও জীবনী। এখানে পাওয়া যায় নানা রকম শিক্ষা, বিস্ময় ও রহস্য– যেগুলো বিবেককে হতভম্ব করে দেয়, নাড়া দেয় হৃদয়কে।

এভাবে কত গ্রন্থ যে বুকে জড়িয়ে ধরেছি; কত রচনা যে কোলে তুলেছি, তার ইয়ত্তা নেই। কোন কিতাব পড়তে পড়তে ক্লান্ত হলে হাতে নিতাম আরেকটি। কখনও পড়তাম, কখনও রিভাইস দিতাম; কখনও আবৃত্তি করতাম। পড়তে পড়তে কেঁপে উঠতাম; কেঁদে ফেলতাম; হেসে উঠতাম; প্রফুল্ল হতাম; ক্রুদ্ধ হতাম; অবসন্ন হতাম; চঞ্চল হতাম।

কিতাবের পৃষ্ঠা যেন আমার সাথে প্রেমালাপ করে; কথা কয়; গল্প করে। কিতাবাদি নিয়ে ঘুমাই মানে আলেম, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও কবিদের সমাবেশে ঘুমাই। আমার কামরায় ছড়ানো গোছানো কিতাব আর কিতাব। ঘুম অবসন্ন না করা পর্যন্ত পড়তে থাকি। ঘুম থেকে জেগে পড়ি; ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও পড়ি। কেননা, পড়াকে আমি পেয়েছি দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মানের সদর দরজা হিসেবে।

পড়াকে আমি পেয়েছি উন্নতি ও অগ্রগতির সুপ্রশস্ত মহাসড়ক হিসেবে। নিঃসঙ্গতা, অস্থিরতা ও বিরক্তির মত রোগের কার্যকর ওষুধ হচ্ছে অধ্যয়ন। তবে যেকোন পড়া উপকারী নয়। উপকারী গ্রন্থ চয়ন, ইলমের সঙ্গে আমল এবং অন্তরের গভীরে কল্যাণের বীজ বোপন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। [আশিক : ৫৫-৬১]
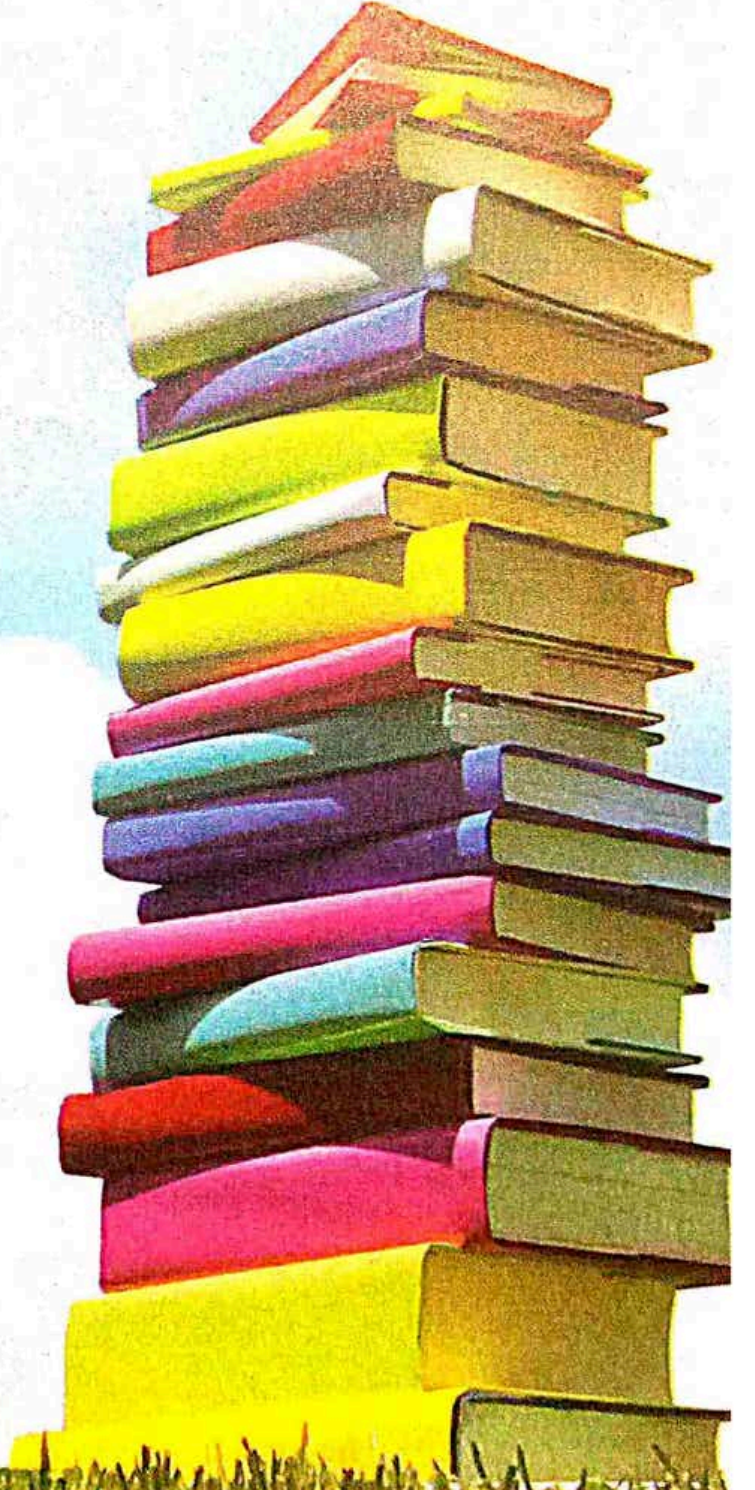
তুমি যেভাবে পড়বে

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের রব। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, আল্লাহর রসুল, তাঁর বংশ ও তাঁর সাহাবীদের উপর।

পরসমাচার, হে তালেবে ইলম! আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভূমিকা পেশ করার সুযোগ নেই। কেননা, সময় তার চেয়েও সংক্ষিপ্ত। এখানে তোমার জন্য কিছু নীতিমালা বয়ান করছি এবং কয়েকটি পরিচ্ছেদ তোমার কাছে তুলে ধরছি, যেগুলো একজন তালেবে ইলমের জন্য প্রয়োজন হয়। এগুলো পাওয়া যাবে ইবনুল জাওযী'র সায়দুল খাতের, ইবনে আবদুল বারের জামিয়ু বয়ানিল ইলম, খতীব আল-বাগদাদী'র আল-ফকীহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ, শাওকানীর নায়লুল আরাব ইত্যাদি গ্রন্থে। এখানে উদ্দেশ্য, কীভাবে ইলম হাসিল করবে, সে কথা বয়ান করা।

কুরআন হিফযের পর মুখস্ত করার মত কিছু কিতাব

০১. বুলূগুল মারাম ফী মুতূনি আহাদীসিল আহকাম।

[টীকা : (بُلُوْغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ) বিভিন্ন হুকুম-আহকাম সম্বলিত প্রায় দেড় হাজার হাদীসের সংকলন। সংকলক হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী আশশাফেয়ী রহ. [৭৭৩-৮৫২ হি.]

অথবা উমদাতুল আহকাম।

[টীকা : (عُمْدَةُ الْأَحْكَامِ مِنْ كَلَامِ خَيْرِ الْأَنَامِ) হাফেয
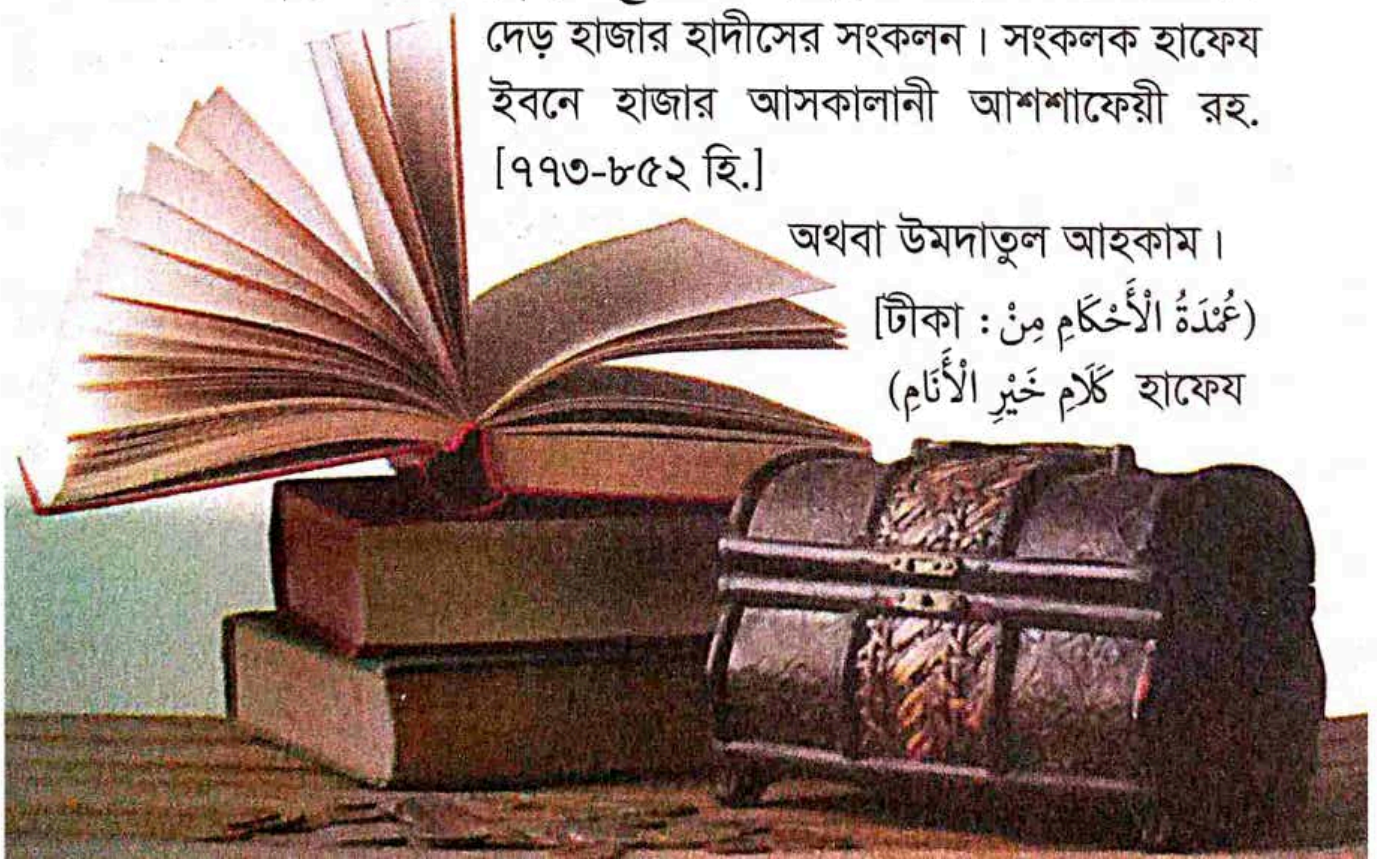
তাকিউদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আবদুল গনী আলমুকাদ্দাসী [৫৪১-৬০০ হি.] রচিত আহকাম সংক্রান্ত হাদীসের সংকলন।]

০২. রিয়াযুস সালেহীন। (খতীব, ওয়ায়েজ ও মুবাল্লিগদের জন্য।)

[টীকা : (رِيَاضُ الصَّالِحِيْنَ) আবু যাকারিয়া ইয়াহ্য়া ইবনে শারাফ নববী আশশাফেয়ী রহ. [৬৩১-৬৭৬ হি.] সংকলিত হাদীসের সংক্ষিপ্ত একটি কিতাব।]

০৩. ফিকহ শাস্ত্রের উপর আল-উমদাহ।

[টীকা : (عُمْدَةُ الْفِقْهِ) আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে কুদামাহ মুকাদ্দাসী আলহাম্বলী রহ. [৫৪১-৬২০ হি.] রচিত ফিকহ শাস্ত্রের কিতাব।]

অথবা যাদুল মুস্তানকি'।

[টীকা : (زَادُ الْمُسْتَنْقِعِ) আবুন নাজা মুসা ইবনে আহমাদ ইবনে সালেম মুকাদ্দাসী হাম্বলী [৮৯৫-৯৬৮ হি.] রচিত ফিকহ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।]

০৪. উসূলে হাদীস বিষয়ে নুখবাতুল ফিকার ও বাইকূনিয়াহ।

[টীকা : (نُخْبَةُ الْفِكَرِ) হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী আশশাফেয়ী রহ. [৭৭৩-৮৫২ হি.] রচিত উসূলে হাদীসের কিতাব।]

[টীকা : (مَنْظُوْمَةُ الْبَيْقُوْنِيِّ) উমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ফাতূহ বায়কূনী, দিমাশকী, শাফেয়ী [?-১০৮০ হি.] রচিত উসূলে ফিকহের খুব সংক্ষিপ্ত একটি কিতাব। কিতাবটি কাব্যে রচিত।

০৫. ইলমে নাহ্ব (আরবী ব্যাকরণের শব্দপ্রকরণ) বিষয়ে মুলহাতুল ই'রাব

[টীকা : (مُلْحَةُ الْإِعْرَابِ) আবু মুহাম্মাদ কাসেম ইবনে আলী হারীরী [৪৪৬-৫১৬ হি.] রচিত নাহব শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত কিতাব।]

বা ইবনে মালিকের আলফিয়াহ,

[টীকা : (أَلْفِيَةُ بْنُ الْمَالِكِ) : নাহ্ব শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত কিতাব। ইবনে আকীল এই কিতাবেরই ব্যাখ্যা করেছেন।]

অথবা কাতরুন নাদা।

[টীকা : (قطر الندى وبل الصدى) জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে হিশাম [৭০৮-৭৬১ হি.] রচিত প্রসিদ্ধ নাহ্ব শাস্ত্রের গ্রন্থ।]

০৬. উসূলে ফিকহ্ বিষয়ে আল-লুমা'

[টীকা :(اللمع في أصول الفقه): আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আলী শিরাজী শাফেয়ী [৩৯৩-৪৭৬ হি.] রচিত উসূলে ফিকহের প্রসিদ্ধ কিতাব।]

অথবা আল-ওয়ারাক্বাত।

[টীকা : (الْوَرَقَاتُ فِي أُصُولِ الْفِقْه) : আবুল মাআলী আবদুল মালিক ইবনে আবদুল্লাহ ইমামুল হারামাইন আলজুওয়াইনী [৪১৯-৪৭৮ হি.] রচিত উসূলুল ফিকহের কিতাব।]
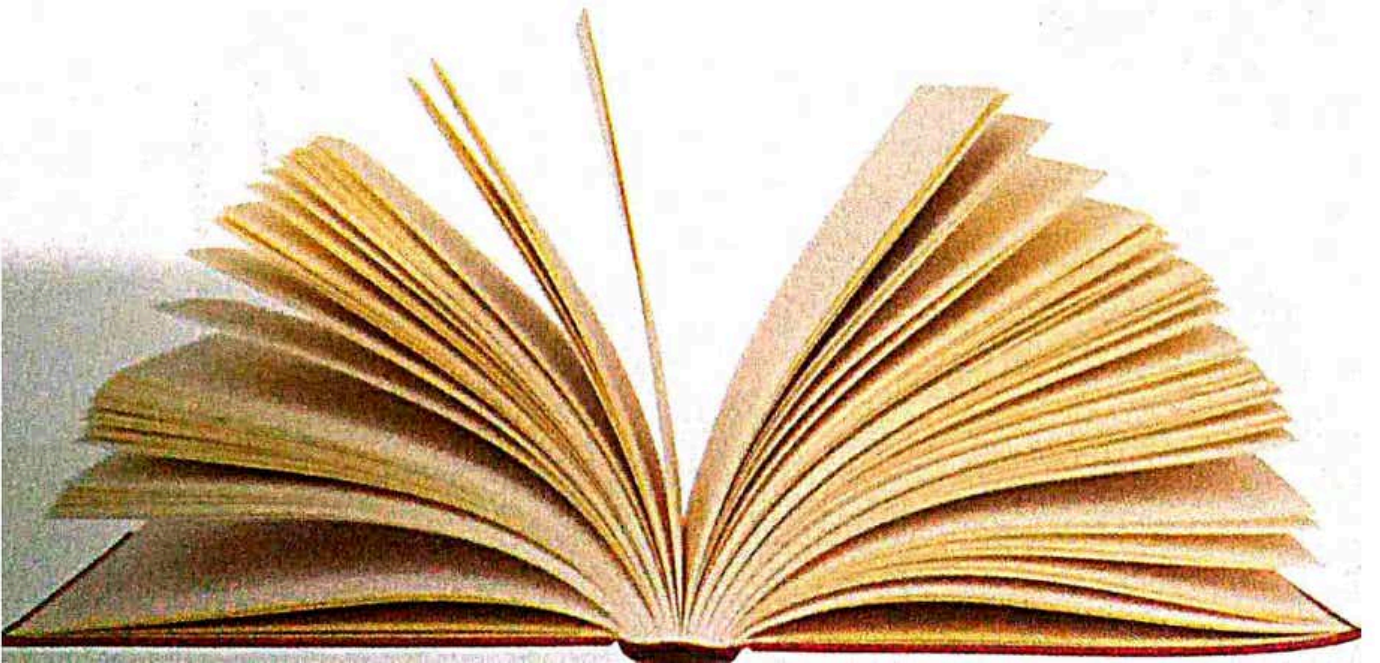
তোমার গ্রন্থাগারে থাকা চাই

০১. আল্লাহ তাআলার মহাগ্রন্থ।

০২. সিহাহ সিত্তা। [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানুত তিরমিযী, সুনানু আবু দাউদ, সুনানুন নাসায়ী ও সুনানু ইবনে মাজাহ।] সবগুলো একত্রে জামেউল উসূল ও মাজমাউয যাওয়ায়িদ নামক কিতাব দুটিতে পাওয়া যাবে।

[টীকা : (جَامِعُ الْأُصُوْلِ فِيْ أَحَادِيْثِ الرَّسُوْلِ) মাজদুদ্দীন আবুস সাআদাত আলমুবারক ইবনে মুহাম্মাদ আলজাযারী ইবনে আসীর [?-৬০৬ হি.] রচিত ৯৫০০ হাদীসের সংকলন। সিহাহ সিত্তার হাদীসগুলো এখানে জমা করা হয়েছে।

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) আবুল হাসান নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর হায়সামী [৭৩৫-৮০৭ হি.] সংকলিত দশ খণ্ডে সমাপ্ত হাদীসের কিতাব।]

০২. ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া।

[টীকা : (مَجْمُوْعُ الْفَتَاوٰى) তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবুল কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে তাইমিয়া আলহাররানী আলহাম্বলী রহ. রচিত ৩৫ খণ্ডে সমাপ্ত ফতোয়ার কিতাব।]

০৩. ফাতহুল বারী

[টীকা : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী আশশাফেয়ী রহ. [৭৭৩-৮৫২ হি.] রচিত সহীহ বুখারী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ। সহীহ বুখারীর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসেবে মুসলিমবিশ্বে সমাদৃত।

০৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর

[টীকা : আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে কাসীর দিমাশকী শাফেয়ী রহ. [৭৭১-৭৭৪ হি.] রচিত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ।]

০৫. মুগনী

[টীকা : (اَلْمُغْنِيْ فِي فِقْهِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ) মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে কুদামাহ [৫৪১-৬২০ হি.] রচিত নয় খণ্ডে সমাপ্ত হাম্বলী মাযহাবের ফেকাহর কিতাব।]

০৬. সুবুলুস সালাম

[টীকা : ইবনে হাজার রচিত বুলূগুল মারাম নামক হাদীসগ্রন্থের ব্যাখ্যা। চার খণ্ডে সমাপ্ত। হাদীসগ্রন্থের ব্যাখ্যা হলেও ফিকহী ধাঁচে রচিত হওয়ার কারণে এই গ্রন্থকে ফেকাহগ্রন্থ বলেই গণ্য করা হয়। প্রায় সমস্ত মাযহাবের আলোচনা এই কিতাবে স্থান পেয়েছে। এর রচয়িতা আমীর মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল সনআনী [১০৯৯-১১৮২ হি.]।]
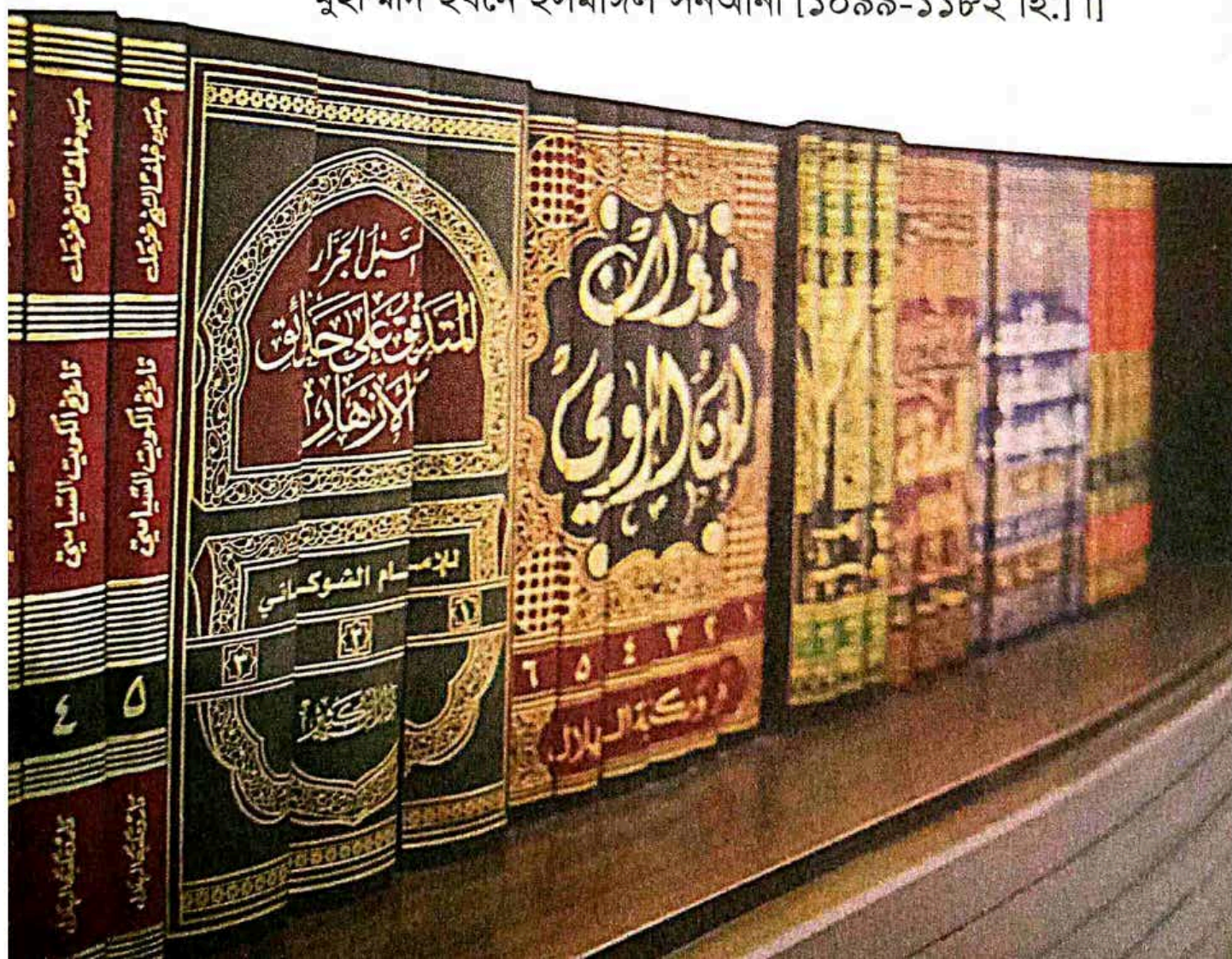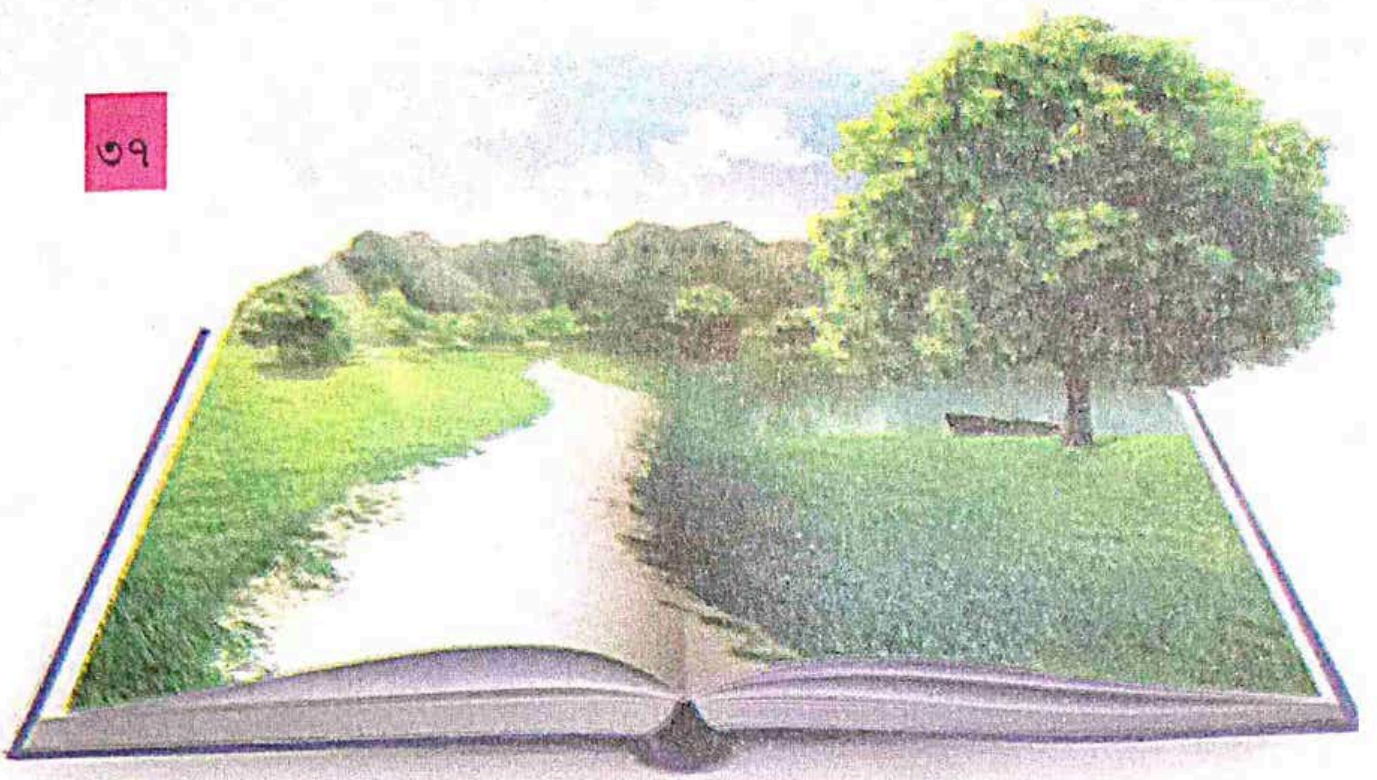
০৭. নাইলুল আওতার

[টীকা : ইবনে তাইমিয়া'র পিতামহ আবুল বারাকাত আবদুল হালীম (ইবনে তাইমিয়া) আহকামসম্বলিত হাদীসসমূহের একটি সংকলন তৈরী করেছিলেন। যার নাম 'মুন্তাকাল-আখবার'। এই কিতাবে প্রায় ৫০০০ হাদীস সংকলিত হয়েছে। মুহাম্মাদ আশ-শাওকানী [১১৭৩-১২৫০ হি.] উক্ত কিতাবের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম নায়লুল আওতার (نَيْلُ الْأَوْطَارِ)। নয় খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থে তিনি উসূলে ফিকহের আলোকে ফিকহী মাসায়েল সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।]

০৮. আল-বেদায়াহ ওয়ান-নেহায়াহ

[টীকা : আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে কাসীর দিমাশকী শাফেয়ী রহ. [৭৭১-৭৭৪ হি.] রচিত বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত। সৃষ্টির সূচনা থেকে অষ্টম হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।]

০৯. যাদুল মাআদ

[টীকা : শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ূব দিমাশ্‌কী [৬৯১-৭৫১ হি.] রচিত ও পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত সীরাতগ্রন্থ। গ্রন্থকার ইবনে কাইয়িম জাওযিয়া নামে প্রসিদ্ধ। কিতাবটির পুরো নাম–**যাদুল মাআদ ফী হাদ্‌য়ি খায়রিল ইবাদ** (زَادُ الْمَعَادِ فِي هَدْيِ خَيْرِ الْعِبَادِ)।

১০. ফাতহুল মাজীদ, বুলূগুল মারাম, রিয়াজুস সালেহীন, জামেউল উলূম ওয়াল-হিকাম, আল-আদাবুশ শরইয়াহ। উত্তম মান, অধ্যয়ন ও আমলই বিবেচ্য বিষয়। সংখ্যাবৃদ্ধির কোন গুরুত্ব নেই।

[টীকা : (فَتْحُ الْمَجِيْدِ شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ) মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব তামীমী রচিত কিতাবুত-তাওহীদ'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম আবদুর রহমান ইবনে হাসান আল-আশ্‌শায়খ [১১৯৩-১২৮৫ হি.]।

(جَامِعُ الْعُلُوْمِ وَالْحِكَمِ) ইবনে রজব হাম্বলী [৭৩৬-৭৯৫ হি.] রচিত চল্লিশ হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

(اَلْأَدَبُ الشَّرْعِيَّةُ) আবু ইসহাক বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুফলিহ আলমুকাদ্দাসী হাম্বলী রচিত যুহ্‌দ, আদব ও আখলাকসম্পর্কিত একটি কালজয়ী গ্রন্থ।]

প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য একটি সময়সূচি

ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত হিফযের সময়। (প্রতিদিন কুরআনের পাঁচটি আয়াত এবং ছোট একটি হাদীস অথবা বড় কোন হাদীসের একটি টুকরা মুখস্থকরণ।

সূর্যোদয়ের পর থেকে যোহর পর্যন্ত একাডেমিক পড়াশোনা। চাকরি। জীবিকা উপার্জন অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য।
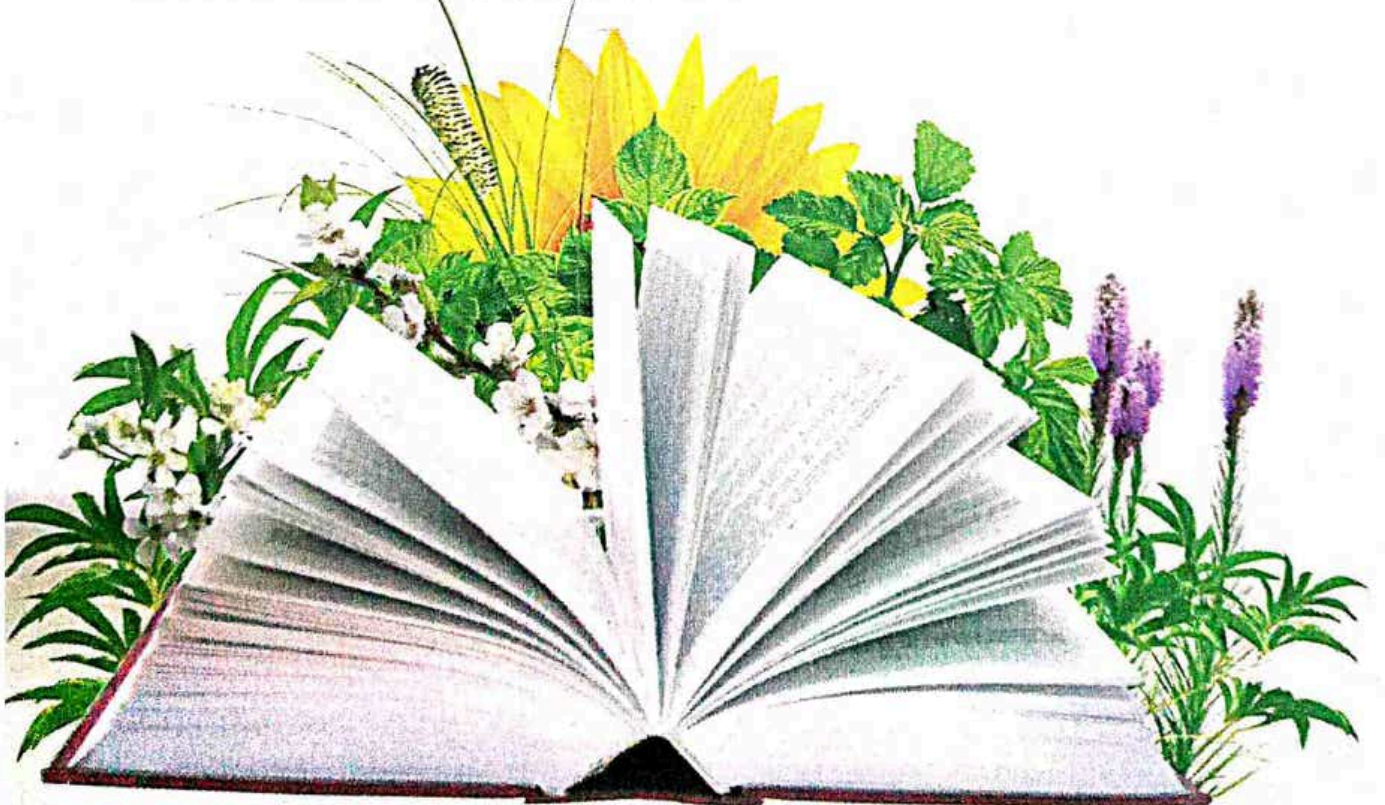
যোহরের পর থেকে আসর পর্যন্ত ইতিহাস ও সাহিত্য অধ্যয়ন। তারপর দুপুরের আহার এবং আহার পরবর্তী বিশ্রাম।

আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত উল্লিখিত মৌলিক গ্রন্থাবলি থেকে অধ্যয়ন।

মাগরিবের পর থেকে এশা পর্যন্ত হিফযকৃত কুরআনের আয়াত ও হাদীস রিভাইস।

এশার সালাতের পর ইসলামী সাময়িক পত্র পাঠ, উপকারী পত্রপত্রিকা অধ্যয়ন এবং তাহযীব ও তামাদ্দুনবিষয়ক গ্রন্থাবলি পড়া। তারপর রাতের আহার। এরপর ঘুম।

বৃহস্পতিবার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সাক্ষাতে গমন। বিনোদনমূলক পুনর্মিলনে যোগদান।

জুমাবারে কুরআন গবেষণা। যিকির-আযকার। অধিক নফল আদায়। নবী আলাইহিস সালামের উপর অধিক দরুদ পাঠ, নিজের হিসাব-নিকাশ এবং সৃষ্টির রহস্য নিয়ে ফিকির।

আকীদাবিষয়ক গ্রন্থাবলি

জেনে রাখা দরকার যে, আকীদার কিতাবাদি তিন স্তরের—

০১. কিতাবুত তাওহীদ।

[টীকা : মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব তামীমী হাম্বলী [১১১৫-১২০৬ হি.] রচিত আকীদাবিষয়ক মশহূর কিতাব।]

০২. মাআরিজুল কাবূল।

[টীকা : হাফেয ইবনে আহমাদ হাকামী হাম্বলী [১৩৪২-১৩৭৭ হি.] রচিত আকীদাবিষয়ক কিতাব।]

০৩. আকীদাতুত তাহাবী।

[টীকা : আবু জা'ফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ সালামা ইবনে সালামা আযদী তহাবী হানাফী [২৩৯-৩২১ হি.] রচিত আকীদাবিষয়ক মশহূর কিতাব। প্রায় সর্বশ্রেণির আলেম এই কিতাবের ব্যাখ্যা লিখেছেন।]

শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষত শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর গ্রন্থাবলি পড়া জরুরী। শাইখুল ইসলামের গ্রন্থাবলির মত গ্রন্থ অন্যত্র পাওয়া খুব মুশকিল।
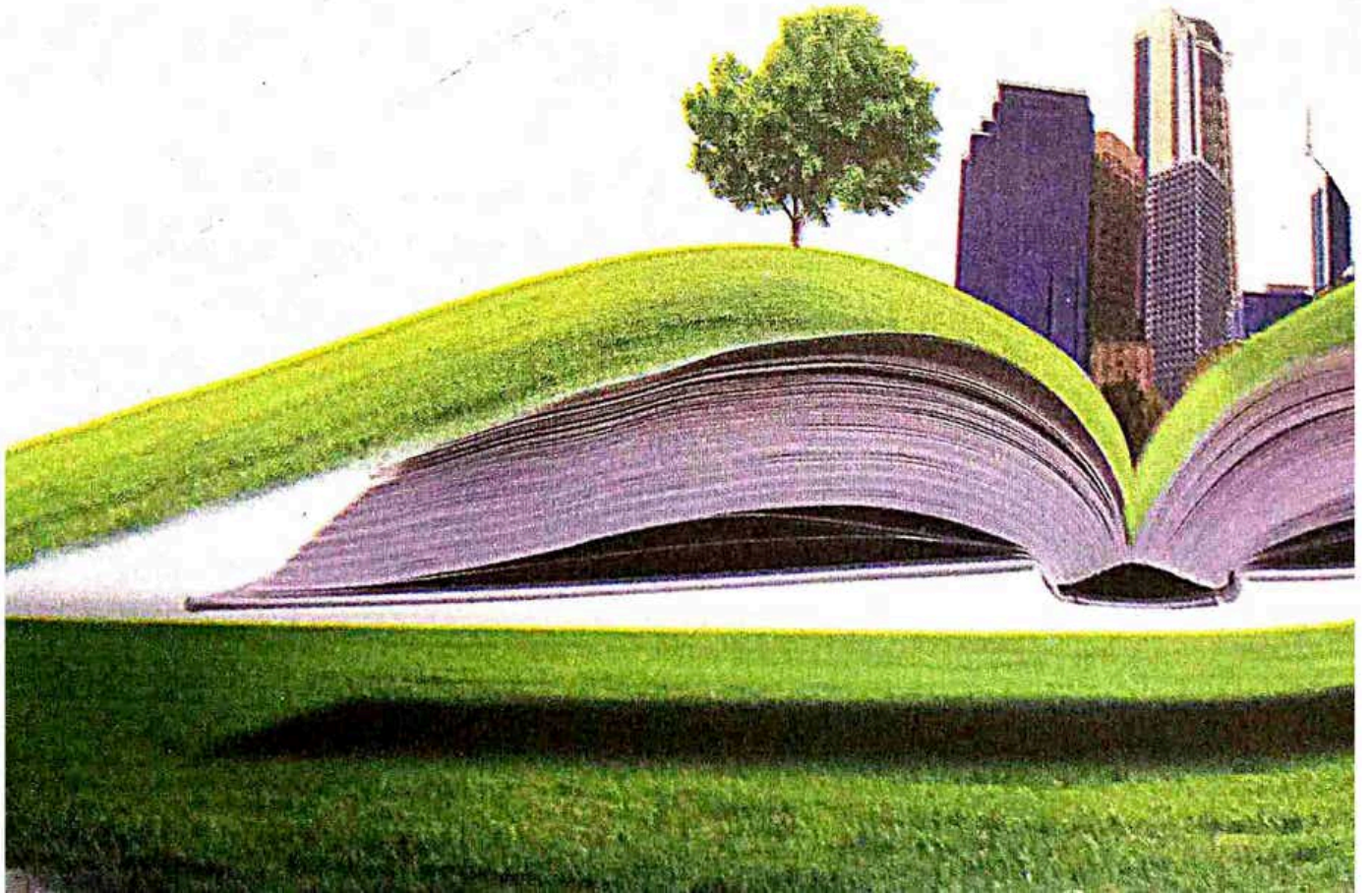
অডিও লাইব্রেরী

আজকাল সাউন্ড লাইব্রেী থাকাও জরুরী এবং তা থেকে ফায়দা হাসিল করাও একটি সুবর্ণ সুযোগ। এর কদর করা উচিত। এর মাধ্যমে অনেক ইলম হাসিল করা যায়। এজন্য তুমি একটি সাউন্ড লাইব্রেরী গড়ে তোলো। বিশেষত গাড়িতে একটি ডেস্ক রাখো। যাতে সময়মত উপকারী বিভিন্ন বিষয় শ্রবণ করা যায়।

বিরক্তিকর গ্রন্থ

ফেকাহ ও উসূলে ফেকাহর কিছু কিছু ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে, যেগুলো তর্কশাস্ত্র, সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও কৃত্রিম আলোচনায় ভরপুর। সেগুলোর উপকার খুব কম। সেগুলো মাথাব্যথা সৃষ্টি করে; সময় অপচয় করে এবং দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করে। যদি তুমি এসব ব্যাখ্যাগ্রন্থের মান যাচাই করতে চাও, তা হলে ইবনে তাইমিয়ার গ্রন্থাবলির সাথে এগুলো তুলনা করে দেখতে পারো।

হিফয করার নিয়ম

যা মুখস্থ করতে চাও, সেটা পরিমাণে খুব সামান্য গ্রহণ করো এবং সেটা বার বার পড়ো; পঞ্চাশ বার, বা তার চেয়েও বেশি। যদি পারো তা হলে হিফযের সময় একজন সঙ্গী যোগাড় করে নাও।
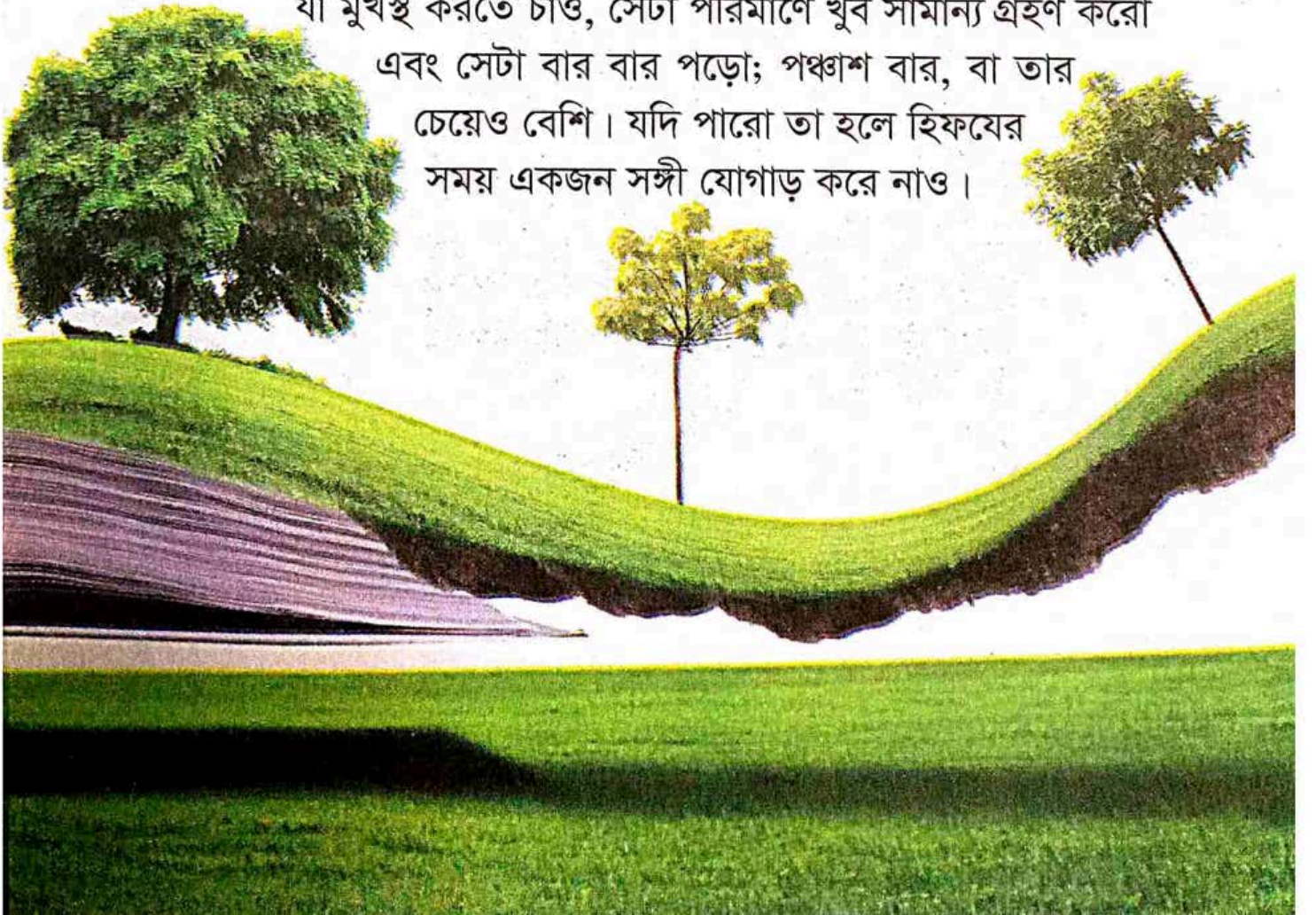
হিফযের জন্য সময় নির্দিষ্ট করো ফজর ও মাগরিবের পর। অলসতা, অতিরিক্ত পেরেশানী ও ঘুমের সময় হিফ্য করতে চেষ্ট কোরো না। আর বেশি বেশি এস্তেগফার করো।

সালাত সময়সূচি গঠন করে

কোনো কোনো শিক্ষার্থী পড়াশোনা ও অধ্যয়নের সময়সূচি তৈরী করে সালাতের সাথে। যেমন, হিফ্যকরণ ফজরের পর। ইতিহাস ও সাহিত্য অধ্যয়ন যোহরের পর। মাসায়েল বিশ্লেষণ আসরের পর। হিফযের রিভাইস (আমুখতা) মাগরিবের পর। পত্রপত্রিকা ও ইসলামী সাময়িকী এশার সালাতের পর।

কোন কোন শিক্ষার্থী একেক বিষয় একেক দিন নির্ধারণ করে। যেমন, ফেকাহ শনিবারে। তাফসীর রবিবারে। হাদীস সোমবারে। ...
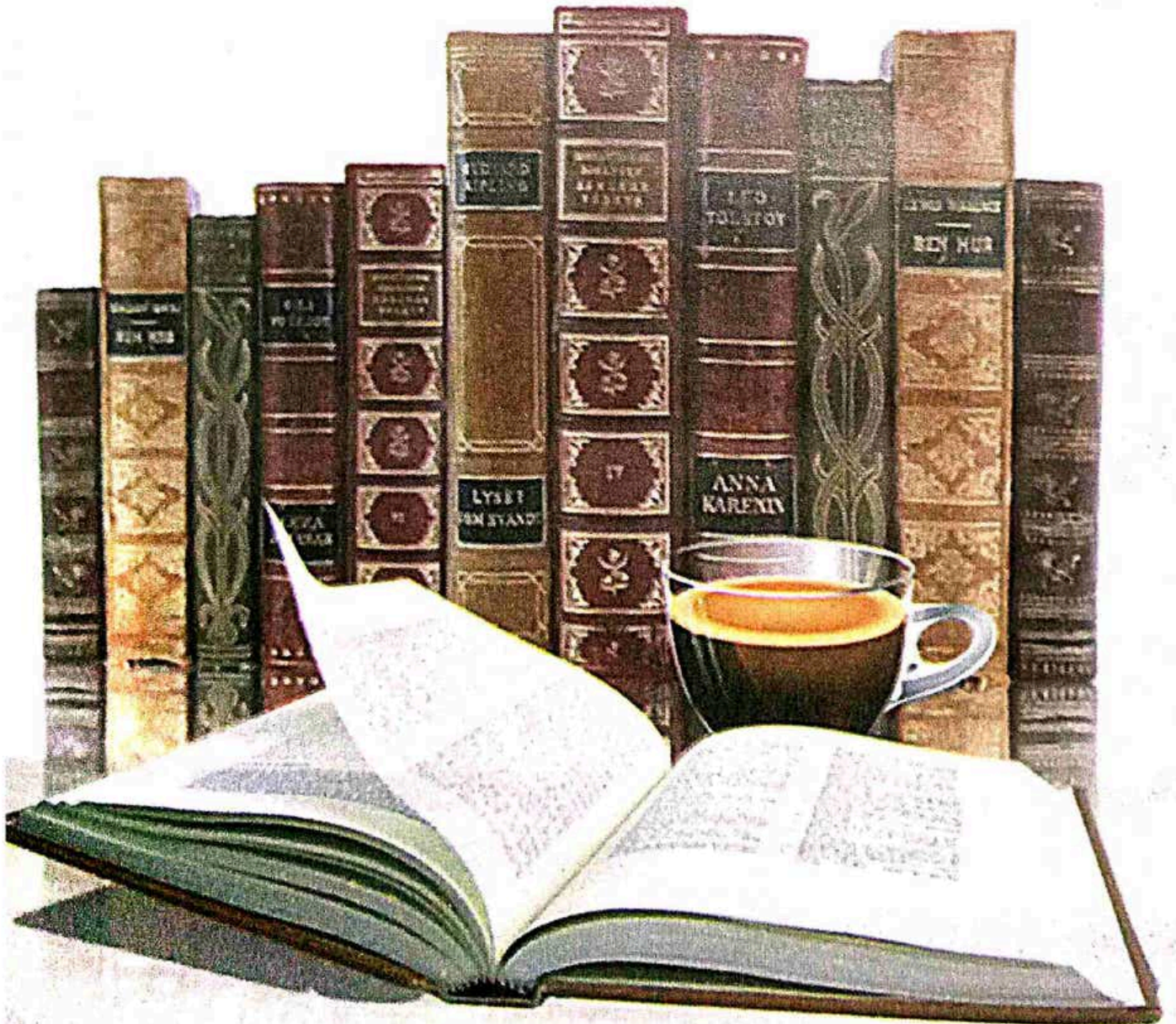
দীর্ঘ কিতাব কীভাবে বুঝে নিবে

কোনো কোনো কিতাব খুব দীর্ঘ হয়ে থাকে। যেমন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ফাতহুল বারী, আলমুগ্‌নী ইত্যাদি। এসব দীর্ঘ কিতাব উপলব্ধি করতে চাইলে শিক্ষার্থীর সামনে কয়েকটি পন্থা আছে।

(ক) প্রতিটি কিতাব তিন অথবা চার বার অধ্যয়ন করবে।

(খ) একটি মূল কিতাব অধ্যয়ন করবে, সাথে সাথে ব্যাখ্যাগ্রন্থও দেখবে। অথবা একটি নোটবুক রাখবে, তার মধ্যে দুর্বোধ্য বিষয়, ফায়দা, সূক্ষ্ম তত্ত্ব, শাস্ত্রীয় খুঁটিনাটি কথা লিখে রাখবে। এরপর আলেম-উলামার সাথে যোগাযোগ করবে।

(গ) কোন সহপাঠীর সাথে লম্বা সময় নিয়ে অনুশীলনী ও বিশ্লেষণ সহকারে অধ্যয়ন করবে।

তালেবে ইলমের সাথে সাক্ষাৎ

শিক্ষার্থী বন্ধুদেরকে তাদের পারস্পরিক দেখাসাক্ষাতের বেলায় আমি সময় নিয়ন্ত্রণ করা, অপচয় না করা এবং সাক্ষাতকে দীর্ঘ না করার জন্য উপদেশ দিব। কেননা, এ রকম পারস্পরিক দেখাসাক্ষাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সময় অপচয়ের কারণ হয়ে থাকে।

সুতরাং বন্ধুদের সাথে দেখাসাক্ষাতের জন্য হয়তো সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, অথবা প্রতিদিন থেকে সামান্য সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে। সেই সাক্ষাতেও থাকা চাই ইলমী ফায়দা, ইলমী প্রশ্নোত্তর।

গ্রীষ্মকালীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধন্যবাদ

গ্রীষ্মকালীন প্রতিষ্ঠানগুলো যে কিছু ইলমী দরসের ব্যবস্থা করে থাকে, তা অবশ্যই একটি উত্তম পদক্ষেপ। সেখানে হিফজ, অনুশীলন ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকে। মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যতের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। আমি অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছি, যেগুলো ফেকাহ, তাফসীর ও হাদীসের উপর মূল্যবান কিছু দরসের আয়োজন করেছে। আল্লাহ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচেষ্টা কবুল করুন। সেগুলোর সামর্থ্য ও তৎপরতা বাড়িয়ে দিন।

খরচ করো, ইলম তোমাকে দিবে

নিজেকে এবং আমার তালেবে ইলম ভাইদেরকে উপদেশ করব ইলম খরচ করতে; বক্তৃতা ও পাঠদানের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দিতে। বিভিন্ন সভাসেমিনারে বয়ানের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে। লেখালেখির মাধ্যমে ইলম বিতরণ করতে। তালেবে ইলমের জন্য উচিত নয় মুসলমানদের উপকার করা থেকে অন্তরায় হওয়া। এতে তার ইলম নষ্ট হবে। মওত এসে পড়বে, অথচ কিছুই রেখে যেতে পারবে না।

তালেবে ইলমের অধ্যয়নের হিম্মত

এই যামানায়ও কিছু কিছু তালেবে ইলম অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সাহস ও সবরের মাপকাঠিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাদের কেউ ইবনে হযমের আল-মুহাল্লা নামক গ্রন্থ বুঝে শুনে পাঁচ বার অধ্যয়ন করেছেন। কেউ বুলূগুল মারাম পড়েছেন পঞ্চাশ বারের বেশি। আরেক জন ফিকিরের সাথে সিয়ারু আ'লামিন নুবালা পড়েছেন তিন বার। এমন লোকও আছে, যিনি তার গ্রন্থাগারের শুরু থেকে শেষ সবই পড়ে যাচ্ছেন।

এই যামানায় রচনার হিড়িক

আজ রচনা ও গ্রন্থাবলি দিয়ে বাজার ভরে গেছে। শিক্ষার্থী অত্যন্ত পেরেশানীর মধ্যে থাকে যে, কী পড়বে এবং কী পড়বে না। আজকের রচনাবলির বেশিরভাগ হচ্ছে আবর্জনা; হয়তো পুনরোক্তি, নতুবা অগভীর; কিংবা এমন বিষয়বস্তু, যার মধ্যে কোন উপকার নেই। সুতরাং তোমার উচিত পূর্ববর্তীদের তথা বড় বড় ইমামদের রচনাবলি গ্রহণ করা; সেইসব আলেমদের গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করা, যাঁরা মূলধারা অবলম্বনকারী, সুন্নতের অনুসারী এবং প্রশস্ত ইলমের অধিকারী।
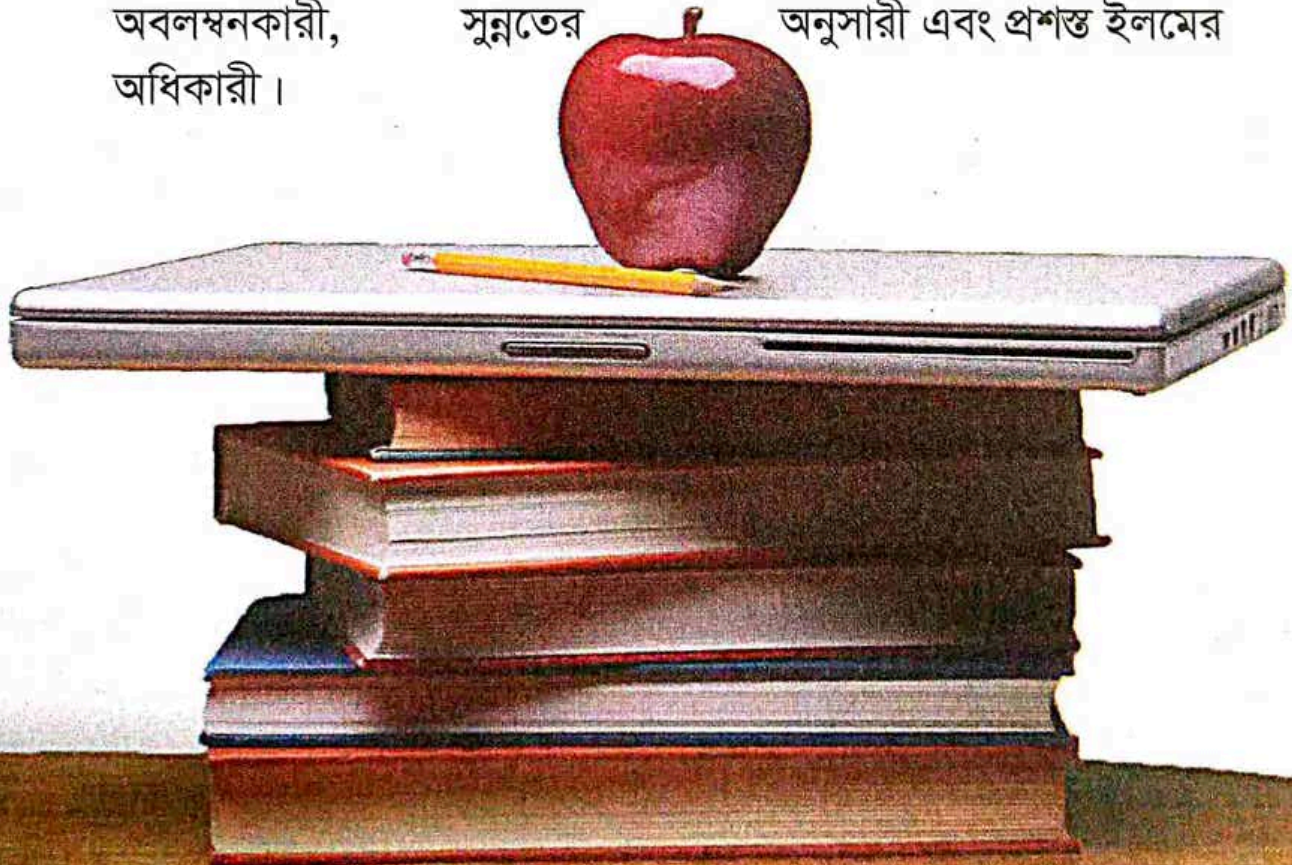
গ্রীষ্মকালীন ছুটির অপব্যবহার

অনেক শিক্ষার্থী মনে করে যে, গ্রীষ্মকালীন ছুটি রাখা হয়েছে আনন্দ ও বিনোদনের জন্য। এবং এটা ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ। কিন্তু যদি এই ছুটি অনর্থক ফুরিয়ে যায় এবং এসময় সিলেবাস ভুলে থাকা হয়, তা হলে এটা হবে ইসরাফ ও অপচয়, যা কিনা শয়তানের ভাইদের কাজ। অচিরেই জীবন অপচয়কারী তার অপচয়কৃত জীবন সম্পর্কে জানতে পারবে।

মাসআলা যাচাইয়ের পদ্ধতি

কয়েকটি কাজের মাধ্যমে মাসআলার যাচাই সম্পন্ন হয়–

০১. যদি শরয়ী মাসআলা হয়, তা হলে কুরআন-সুন্নাহ থেকে ভাষ্য সমবেত করা।

০২. হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার উপর দৃষ্টিপাত করা।

০৩. স্বচ্ছতার সাথে আয়াত ও হাদীস উদ্ধৃত করা।

০৪. মাসআলায় শুধু আলেমদের অভিমত উল্লেখ করা।

০৫. উসূলে ফিকহের আলোকে বিভিন্ন মত পর্যবেক্ষণ করা।

০৬. কারণ বর্ণনা করে বিশুদ্ধ মত উল্লেখ করা এবং অন্য মতগুলো অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ দর্শানো।

হাদীস খুঁজে বের করার পদ্ধতি

দুই পদ্ধতিতে হাদীস অনুসন্ধান করা যায়।

০১. সম্ভাব্য ক্ষেত্র ও বর্ণনাকারীদের থেকে অনুসন্ধান। এর জন্য কয়েকটি কাজ প্রয়োজন–

(ক) যদি তুমি অনুসন্ধান ও বর্ণনার সম্ভাব্য স্থান সম্পর্কে জান, তা হলে খুব ভালো।

(খ) যদি তোমার এই ধারণা না থাকে, তা হলে সূচিপত্র ও

কোষ থেকে অনুসন্ধান করতে হবে।

(গ) তা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে কোন হাদীসের শব্দমূল গ্রহণ করো এবং হরফভিত্তিক কোষ অনুসন্ধান করো। হাদীসের প্রসিদ্ধ নয় কিতাবে থাকলে, পাওয়া যাবে।

০২. রিজাল শাস্ত্রের সাহায্যে সনদের একেক ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসের মধ্যে অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

০৩. হাদীসের ব্যাপারে আলেমদের অভিমত জমা করতে হবে, যাতে হাদীসের ব্যাপারে সুদৃঢ় কোন সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে।

ইহয়ায়ু উলূমিদ্দীন

ইমাম গাযালী'র ইহ্য়ায়ু উলূমিদ্দীন কিতাবের তিন বিষয়ে সতর্ক থাকবে। তারপর এই কিতাব থেকে ফায়দা নিবে।

প্রথম বিষয়

তিনি মুহাদ্দিস ছিলেন না। এজন্য অনেক মউযূ হাদীস এই কিতাবে জমা করেছেন।

দ্বিতীয় বিষয়

লেখক আকীদার ব্যাপারে আশআরী ছিলেন। এই আকীদা-বিশ্বাস কালামশাস্ত্র ও দর্শনের মিশ্র রূপ।

তৃতীয় বিষয়

গাযালী প্রচণ্ড রকমের সুফী ছিলেন। এজন্য সুফীদের কল্পকাহিনী ও
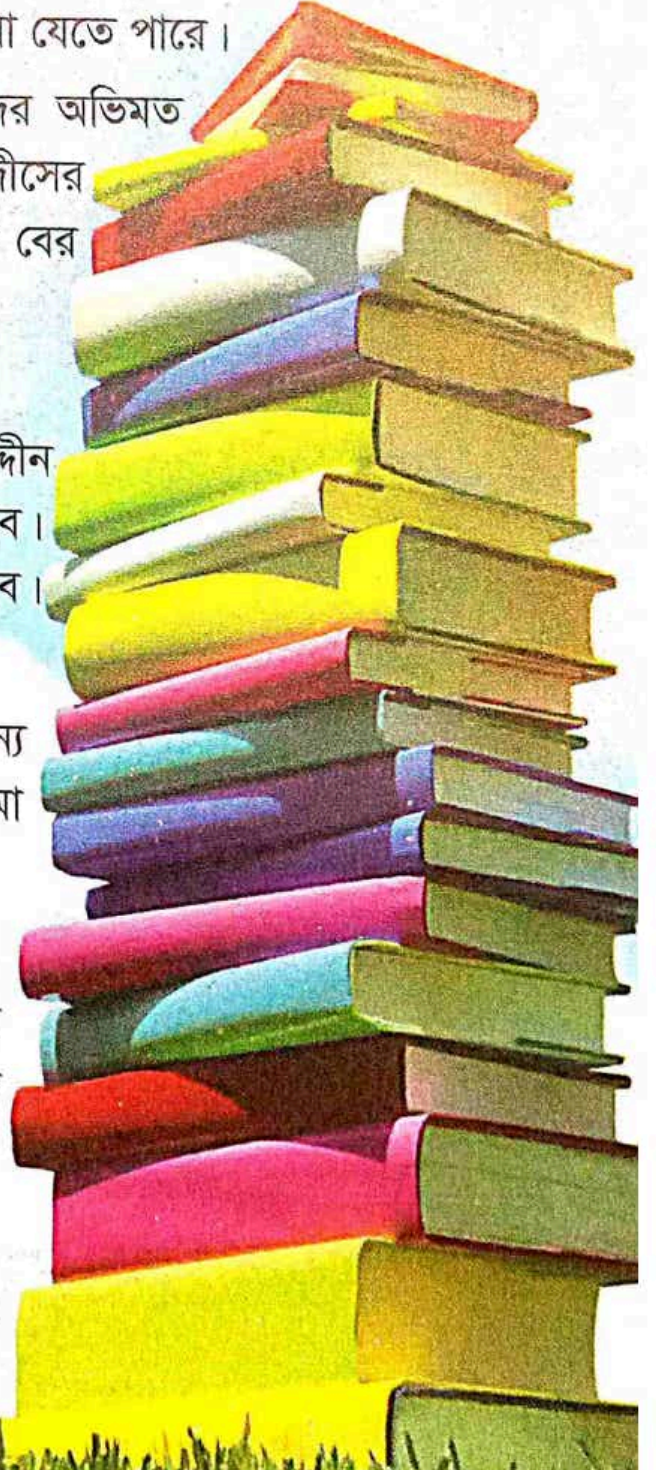
ভিত্তিহীন অনেক তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন। এজন্য তোমাকে সাবধান থাকতে হবে। তুমি নিজের মাপকাঠি বানাও কুরআন ও সুন্নাহকে।

জুমার একটি খুতবা বানাও

০১. সপ্তাহের শুরুতেই খুতবার বিষয়বস্তু নির্বাচন করে নাও।

০২. উক্ত বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য এবং পূর্ববর্তী আলেম ও বুযুর্গদের বক্তব্য জমা করো।

০৩. খুতবার কাঠামো হওয়া চাই সাহিত্যের। মর্মস্পর্শী, সহজ ও প্রাঞ্জল।

০৪. খুতবা লেখা ও সংকলনের পর তা মুখস্থ করে নেওয়া যেতে পারে। অথবা কাগজ দেখে পড়া যেতে পারে; তবে পড়া হতে হবে জীবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী।

০৫. প্রথম ও দ্বিতীয়– উভয় খুতবার সময় যেন আধা ঘণ্টার চেয়ে বেশি না হয়।

০৬. ক্যাসেটে যে খুতবা ধারণ করা হয়, সেটা শোনার জন্য উৎসাহ থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা, এতেও উপকার আছে।

০৭. খুতবার শুরু ও শেষে খুব বেশি পরিমানে ইস্তেগফার, দোআ ও তাসবীহ পাঠ করবে।
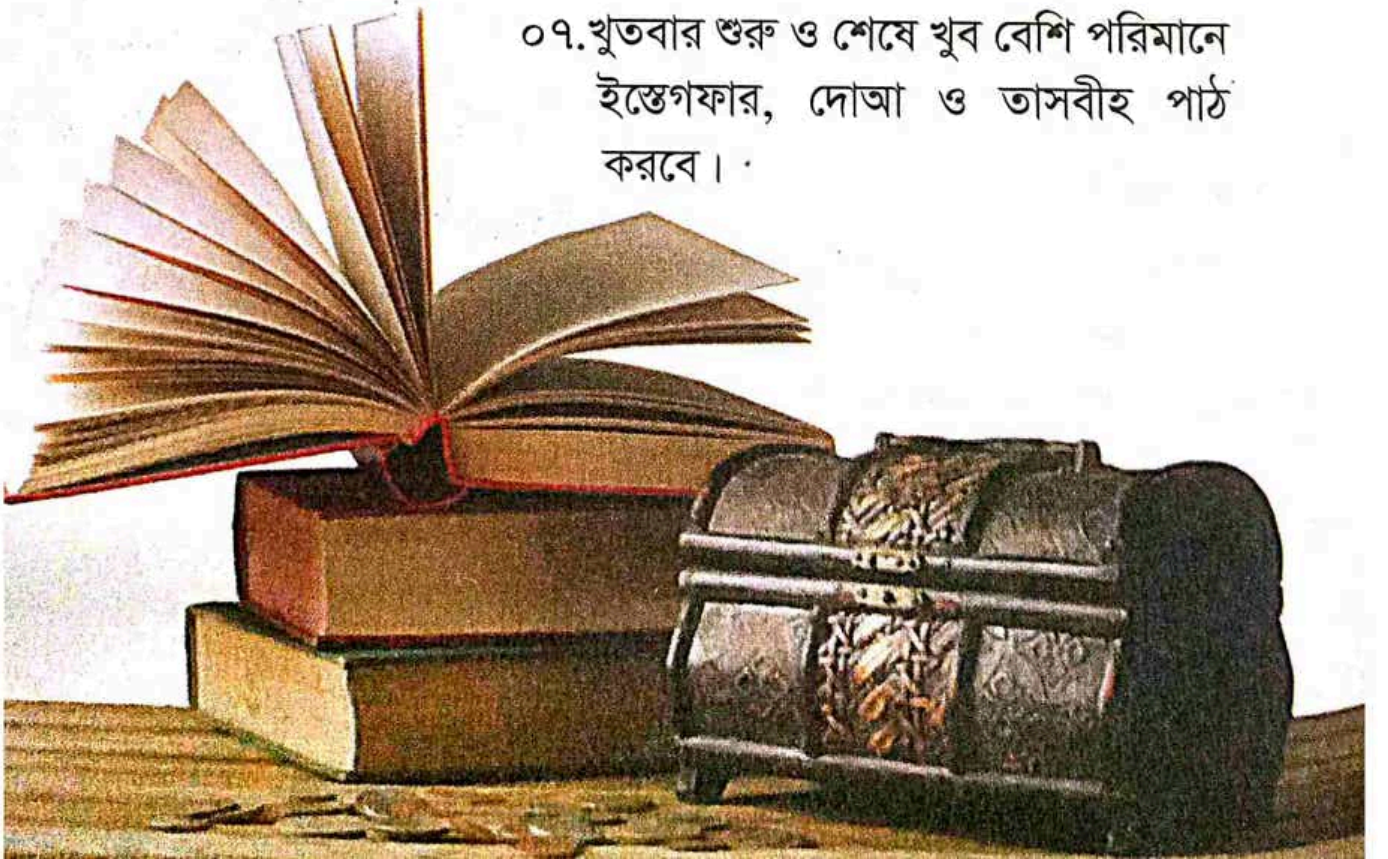
শিক্ষার্থীর জন্য উপকারী কিছু সাহিত্যগ্রন্থ

০১.আল-মুখতারাত। [মাহমূদ সামী আলবারূদী [১২৫৫-১৩২২ হি.] রচিত গদ্যসংকলন।]

০২.উনসুল মাজালিস। [হাফেয আবু উমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বার নামিরী আন্দালূসী [৩৬৮-৪৬৩ হি.] রচিত উপদেশমূলক গ্রন্থ।]

০৩.নুযহাতুল উক্বালা ওয়া রওদাতুল ফুদালা। [হাফেয আবু হাতেম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান ইবনে মুআয ইবনে মা'বাদ তামীমী, বুসাইতী [?-৩৫৪ হি.] রচিত সাহিত্যগ্রন্থ।]

০৪.আবু তাম্মাম, মুতানাব্বী, শাওকী, হাফেয ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ইকবালের কবিতা সংকলন। এদের ভালো ভালো কবিতা যতটা সম্ভব মুখস্থ করো। কেননা, কবিতা ইসলামী দাওয়াতের অস্ত্রাগারের মত।

শিক্ষার্থীর কিছু রোগ

তিনটি রোগ তালেবে ইলমের মধ্যে খুব বেশি পাওয়া যায়। যারা এসব রোগে আক্রান্ত হয়, তারা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। আল্লাহর কাছে আমরা এসব রোগ থেকে নিরাপত্তা ও আরোগ্য কামনা করি।
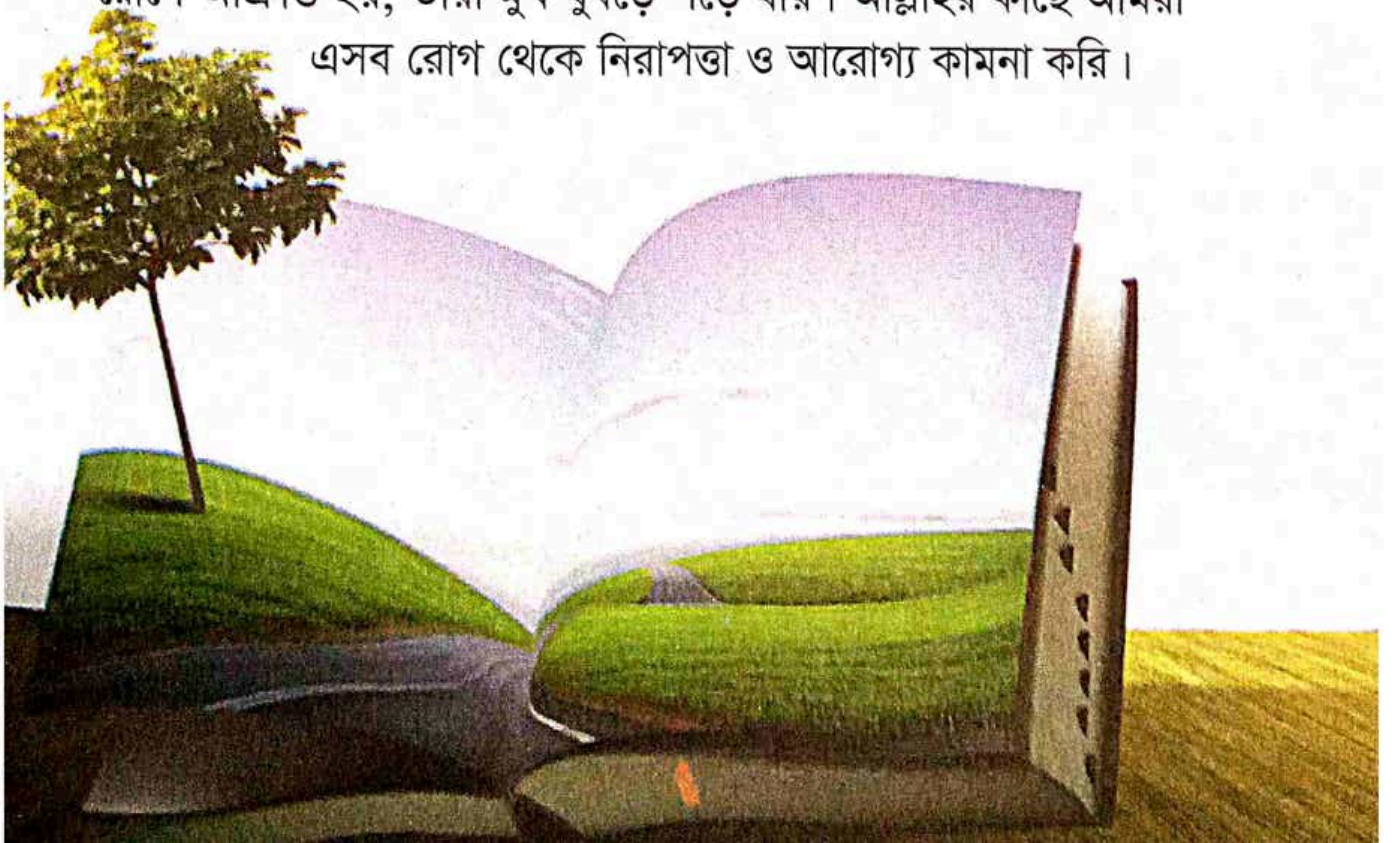
প্রথম রোগ

ইলম হাসিল, ওয়াজ-উপদেশ-দাওয়াত ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে রিয়া তথা লৌকিকতা। মানুষকে আকৃষ্ট করার প্রবণতা। এই রোগ থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে সততা ও এখলাস।

দ্বিতীয় রোগ

হিংসা। তালেবে ইলমদের মধ্যে এই রোগ অত্যন্ত ব্যাপক। এর চিকিৎসা হচ্ছে কাযা ও কদরের উপর ঈমান মজবুত করা এবং আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহ কামনা করা।

তৃতীয় রোগ

অহঙ্কার। এটা মনের তাগূত, আত্মার ফেরাউন ও তালেবে ইলমদের নমরূদ। এতে যারা আক্রান্ত হয়, তাদের বদলা হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনা, অপমান ও গ্লানী। এ থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে বিনয় অবলম্বন ও আত্মপরিচিতি।

কারও ত্রুটি সংশোধনের পন্থা কী?

যদি কোন ব্যক্তি মাসআলা বয়ান করার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন বলে জানতে পার, তা হলে সাথে সাথে প্রতিবাদ কোরো না; বরং সুযোগ থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করো। জেনে নাও তার উদ্দেশ্য কি এবং যে অভিযোগ তার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, তা সঠিক কি না? সঠিক মাসআলা তার সামনে তুলে ধরো। দেখো, তার ভুল থেকে ফিরে আসে
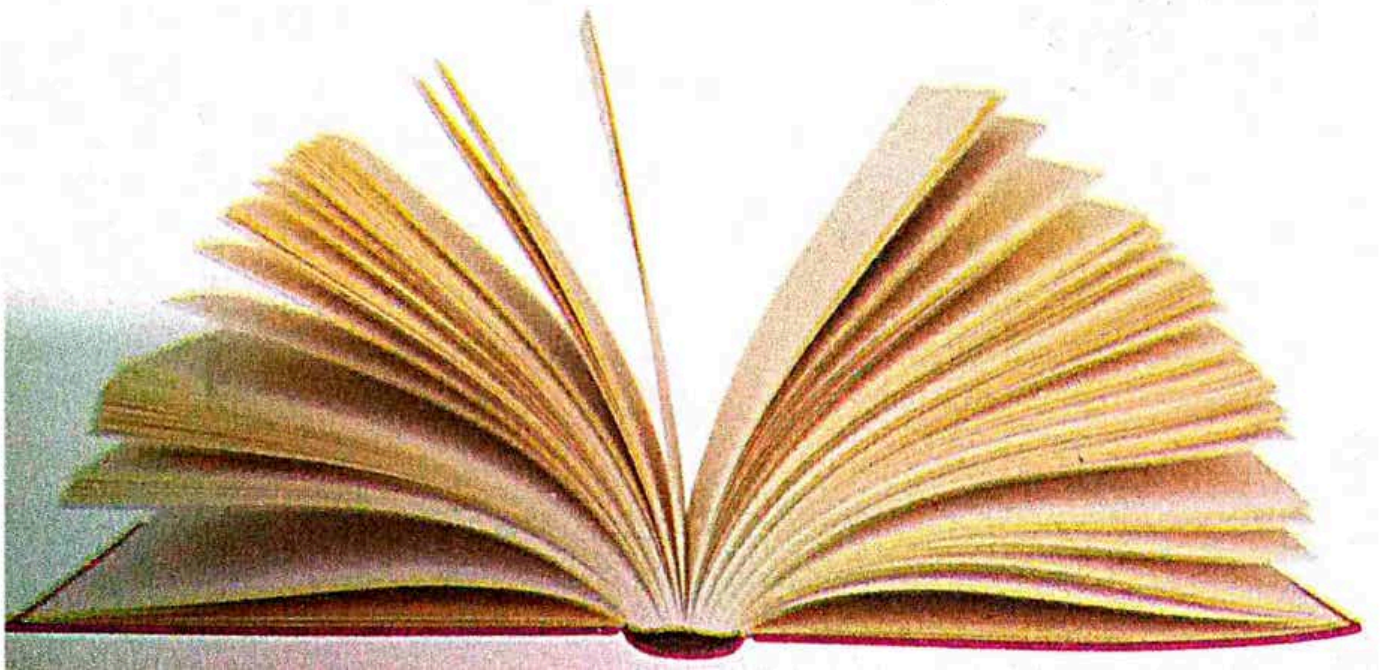
কি না? এই করণীয় হচ্ছে তখন, যখন মাসআলাটি হবে সর্বস্বীকৃত, অথবা যার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অথবা নবীজীর কোন স্পষ্ট ও সহীহ হাদীস আছে। আর যদি মাসআলাটি বিরোধপূর্ণ হয়, তা হলে তার উপর চাপ সৃষ্টি কোরো না; তাকে অভিযুক্ত কোরো না। কেননা, মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে অবকাশ আছে এবং পূর্ববর্তীদের মধ্যে বিরোধ ছিল।

তালেবে ইলম, ফতোয়ার ক্ষেত্রে সুদৃঢ় থাকো

ফতোয়া হচ্ছে গুরুতর ও ঝুঁকিপূর্ণ একটি বিষয়। এটা রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে জারী হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে ত্বরিতপ্রবণতা ও আত্মবিনাশকে ভয় করো। আশ্রয় নাও একটি বাক্যের। তা হল 'আমি জানি না'। মুত্তাকী লোকদের মতে এই বাক্যটি ঠান্ডা পানির মত।

নেককারদের জীবন অধ্যয়ন

পূর্ববর্তী আলেম, আবেদ ও যাহেদদের জীবন অধ্যয়ন কতই না চমৎকার একটি কাজ! এতে জীবন গড়ে ওঠে; সৌজন্যবোধ বৃদ্ধি পায়; বাড়ে পাঠকের সাহস। এদের মধ্যে সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও ইমাম হচ্ছেন মুহাম্মাদ আলাইহিস সালাম। তারপর খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরাম। এরপর আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরাম। যেমন, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, যুহরী, মালেক, শাফেয়ী, আবু হানীফা, আহমাদ ও মুহাদ্দিসীন এবং পর্যায়ক্রমে পরবর্তী উলামায়ে কেরাম।

সীরাতের সুন্দরতম কিতাব

আমি ইবনে কায়্যিমের 'যাদুল মাআদ'র চেয়ে সুন্দর ও মুগ্ধকর কিতাব আর কোনটি দেখিনি। কিতাবটি যেমনই উপকারী; তেমনই মজাদার ও মোহনীয়। বিশেষত তাহকীককৃত প্রচলিত সংস্করণ। যদি এর সাথে

দালাইলুন নুবুওয়াহ অধ্যয়ন কর, তা হলে সোনায় সোহাগা।

কোন কিতাব ফায়দামুক্ত নয়

এই বাক্যটি ইবনুল জাওযী'র। তার সায়দুল খাতির কিতাবে উল্লেখ আছে। এটি অন্যতম একটি সুন্দর বাক্য। সুতরাং মুসলমানের কোন গ্রন্থকে তুচ্ছ মনে করবে না। কেননা, খড়ের মধ্যেও মুক্তা পাওয়া যায়। কত যাচাইকৃত পরিচ্ছন্ন মাসআলা পাওয়া যায় ছোট ছোট কিতাবে, যা তুমি বহু খণ্ড সম্বলিত বড় কিতাবে পাবে না।

আহকামের মৌলিক কিতাবাদি

ইবনে হযমের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, যথার্থই চারটি গ্রন্থ হচ্ছে আহকামের মৌলিক কিতাব। সেগুলো হচ্ছে–

ইবনে কুদামাহ'র আলমুগনী, বায়হাকী'র সুনান, ইবনে আবদুল বার'র আত্‌তামহীদ ও ইবনে হযমের আলমুহাল্লা। আমি বলি, আর পঞ্চম কিতাব হচ্ছে ইবনে
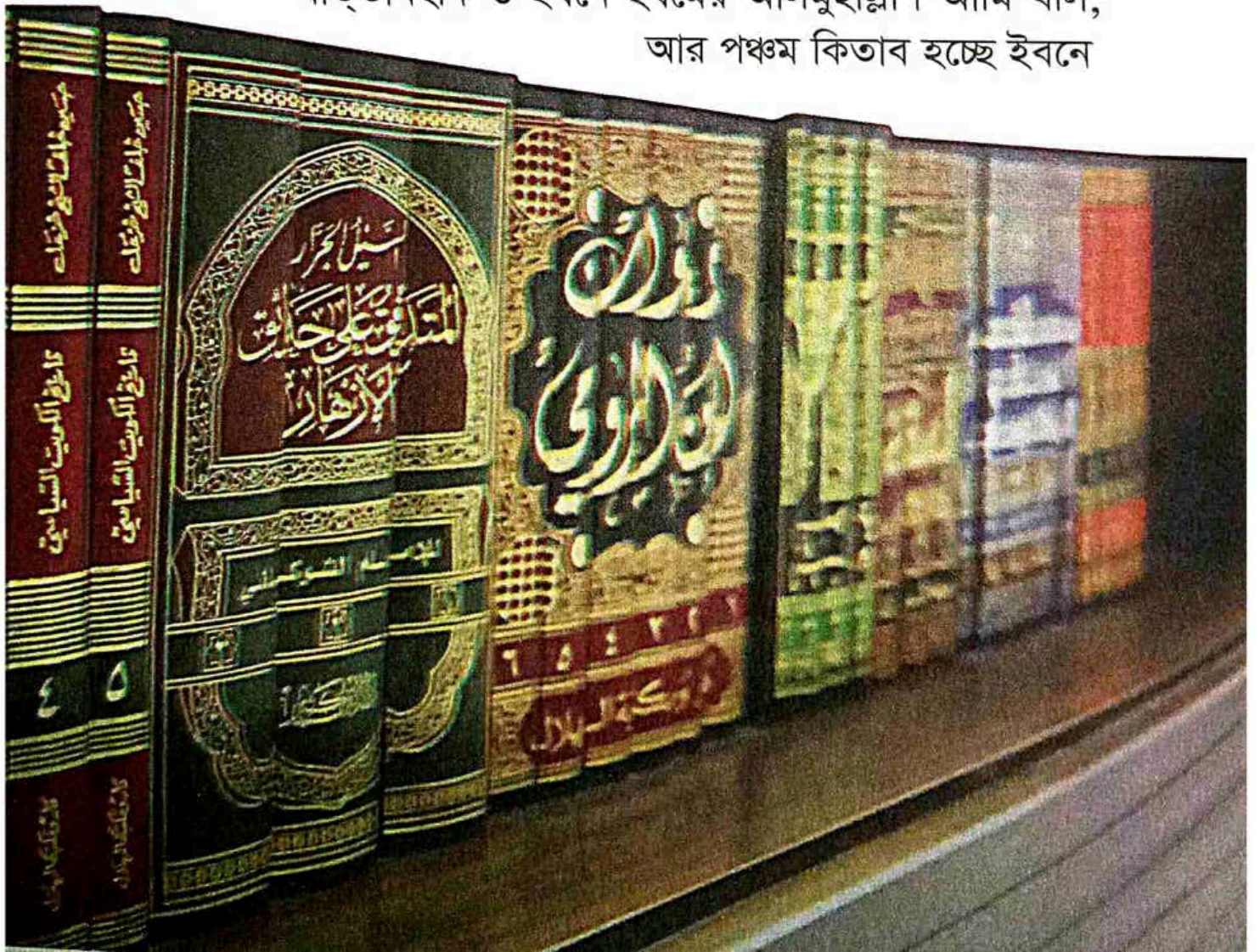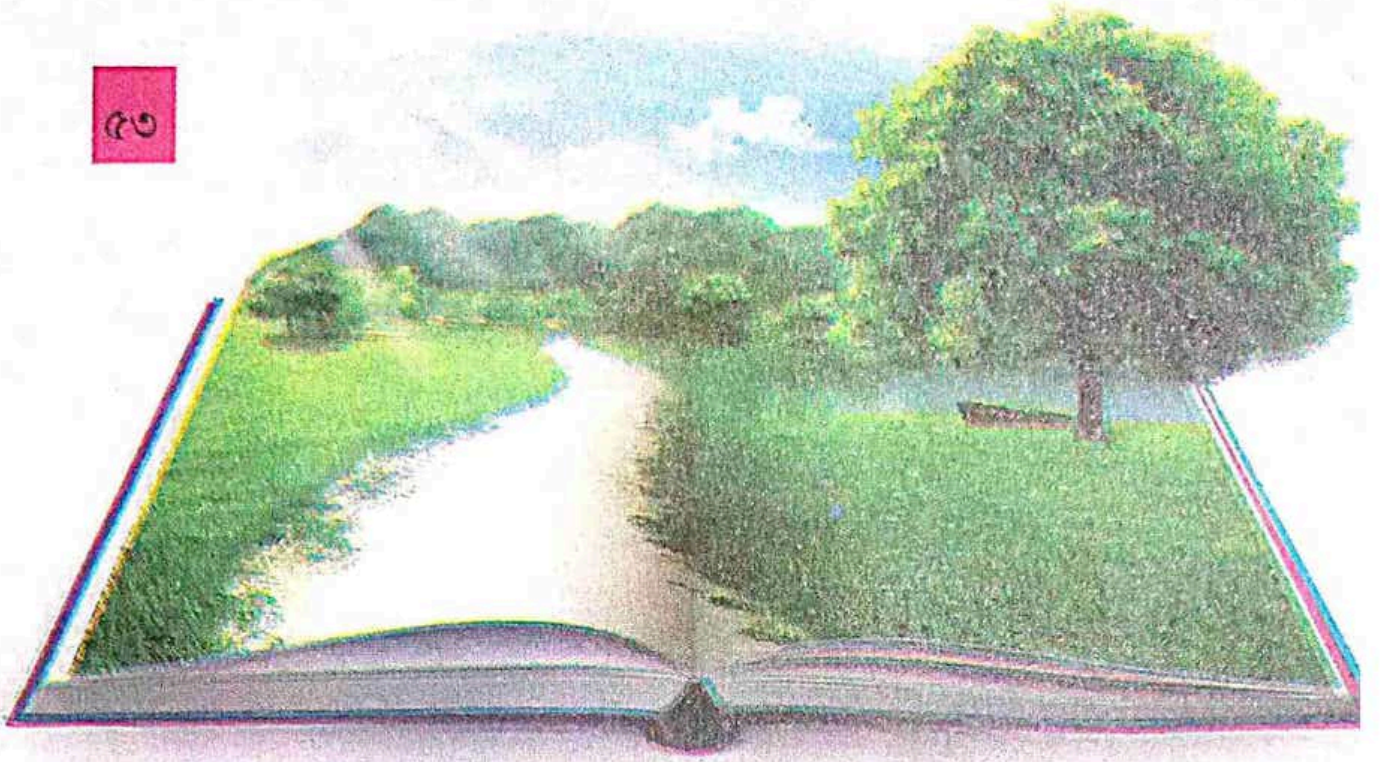
তাইমিয়া রহ.-এর ফাতাওয়া। হে তালেবে ইলম, সবসময় তুমি এগুলো আওড়াতে থাকো। কতই না ভালো হত, যদি তোমার ধৈর্য ও সাহস থাকত যে, তুমি কিতাবগুলো আগাগোড়া পড়ে ফেলবে; হোক তা মাত্র একবার।

কুরআন কীভাবে হিফ্য করবে?

০১. হিফযের উদ্দেশ্য ঠিক করো। শুধু আল্লাহর জন্য হিফ্য করো।

০২. প্রতিদিন খুব কম পরিমাণে মুখস্থ করো।

০৩. দিনের শেষে মুখস্থকৃত আয়াতগুলো পুনরাবৃত্তি করো।

০৪. তোমার একজন সাথি থাকা চাই। সে তোমার পড়া শুনবে; তুমি তার পড়া শুনবে।

০৫. ক্যাসেটকৃত কুরআন খুব বেশি পরিমাণে শুনতে থাকো।

০৬. যতটুকু মুখস্থ করবে, ততটুকু ফরয, নফল ও তাহাজ্জুদের সালাতে তেলাওয়াত করতে থাকো।

০৭. মুখস্থকৃত আয়াতগুলোর তাফসীর পাঠ করো, যাতে হিফয সহজ হয়।

বিক্ষিপ্ত পাঠ

বিক্ষিপ্ত পাঠ আলেম তৈরী করে না; ঝগড়াটে সৃষ্টি করে। এ হচ্ছে যেকোন কিতাব থেকে বিশৃঙ্খল পড়াশোনা। যেখানে নিয়মের কোন পাবন্দী নেই। পাঠক যেকোন জায়গা থেকে দু'চারটি বাক্য মুখস্থ করে, যেগুলোর মধ্যে সম্পৃক্তি নেই। এমন পড়া মকসুদও নয়; ফলপ্রসুও নয়।

দলাদলি থেকে পালাও

তালেবে ইলম হচ্ছে শান্তহৃদয়; ভিতর-বাহিরে পবিত্র। রূহের রোগব্যধি, হিংসা-বিদ্বেষ, তিরস্কার ও পরনিন্দা ইত্যাদি সৃষ্টি হয় পরিত্যক্ত ও অভিশপ্ত দলাদলি থেকে। এই বস্তুটিই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। [কুরআনে বলা হয়েছে,] তারা দু'জন [হারূত ও মারূত জাদু] শিখানোর আগে বলতেন, নিশ্চয় আমরা পরীক্ষার বিষয়, সুতরাং তুমি কাফের হয়ো না। তারপরও মানুষ তাদের কাছে ওই বস্তু শিখত, যার মাধ্যমে তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করত।

[সূরা বাকারা: ১০২]

সুতরাং হে শিক্ষার্থী! দলবাজ হওয়া থেকে বিরত থাকো। অন্যথায় মানুষের অন্তর তোমাকে ঘৃণা করবে এবং অনেক মুসলমান ভাইকে তুমি হারিয়ে ফেলবে। সমস্ত মুসলমানের সাথে কাতারবন্দী হও এবং সমস্ত মুসলমানকে সাহায্য করো। প্রত্যেক মুসলমানের হক রয়েছে তোমার কাছে।

নিষ্ফল বিতর্ক পরিহার করো

যেসব মাসআলার প্রয়োগ নেই এবং প্রয়োগের সম্ভাবনাও নেই, সেগুলো নিয়ে তালেবে ইলমের ব্যস্ত হওয়া বোকামী। তালেবে ইলমের এমনসব মাসআলায় লিপ্ত হওয়াও বোকামী, যেগুলোতে কোন ফায়দা নেই; আবার কিছু কিছু মাসআলায় বিরোধী মতামত লালনকারীর উপর ক্ষোভ ও গোস্বা প্রকাশ করা হয়, অথচ সেগুলোতে ইলমের স্বল্পতার কারণে মুসলমানের নীরব থাকার অবকাশ আছে। আল্লাহ হচ্ছেন আশ্রয়স্থল।

নেতিবাচক ও সংকীর্ণমনা হয়ো না

আহলে সুন্নতের আলেমদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা উদার মনোভাবের মানুষ। মুসলিম সমাজের উপকার সাধনে তারা বদ্ধপরিকর। আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের প্রশ্নে তারা সমাজের সাথে একাকার হয়ে যান। এতে তোমার যদি কোন সন্দেহ থাকে, তা হলে তাদের জীবনচরিত পাঠ করো। গুটিয়ে থাকা, ইলম গোপন করা, উপকার সাধনে কার্পণ্য, রুদ্ধ মনোভাব, বিরক্তি প্রকাশ ও ইলম বিতরণে অসন্তোষ– এগুলো তাতারী আলেমসমাজ ও হিন্দুস্তানী সুফীদের বৈশিষ্ট্য।

কিছু লোকের পছন্দ শুধু ক্ষতস্থান

কিছু কিছু লোক মাছির মত; তারা শুধু ক্ষতস্থানে গিয়ে বসে। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া'র একটি সুন্দরতম বাণী। ইবনে সা'দী বাণীটি তাঁর ত্বরীকুল য়ুসূল নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। অর্থাৎ কিছু

মানুষকে শুধু দেখতে পাবে যে, তারা অন্যদের সমালোচনা করছে। ব্যক্তি, দল ও জনগোষ্ঠীর সৌন্দর্য তাদের নজরে পড়ে না। তারা শুধু অন্যদের দোষ আলোচনা করে। এই কিসিমের লোকেরা হচ্ছে মাছির মত। মাছি সুস্থ স্থানে বসে না; বসে শুধু ক্ষত ও আহত স্থানে। এর কারণ হচ্ছে মনে হীনতা ও মেজাযের বিকৃতি। এর উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে শেক দেওয়া অথবা শ্বাসরোধ করা, যাতে পাগলামী দূর হয়ে যায়।

যিকির, তালেবে ইলমের এবাদত

তালেবে ইলমের সবচেয়ে বড় নফল কাজ হচ্ছে আল্লাহর যিকির। সব সময়। দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায়। কেননা, তালেবে ইলম বেশিরভাগ সময় সফরের হালতে থাকে; নফল সালাত আদায় ও সিয়াম পালন করতে পারে না। সুতরাং হে তালেবে ইলম! প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকো। এটা তোমার জন্য অন্যান্য এবাদতের চেয়ে উত্তম। এটা তোমাকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।

জ্ঞানের কথা মুমিনের হারানো সম্পদ

তালেবে ইলমের জন্য জ্ঞানের কথা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। সে যে-ই বলে থাক, যেখানেই বলে থাক। কেননা, শয়তান আবু হোরায়রাকে আয়াতুল কুরসী শিখিয়েছিল। তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, সে তোমাকে সত্য বলেছে; যদিও সে মিথ্যুক।
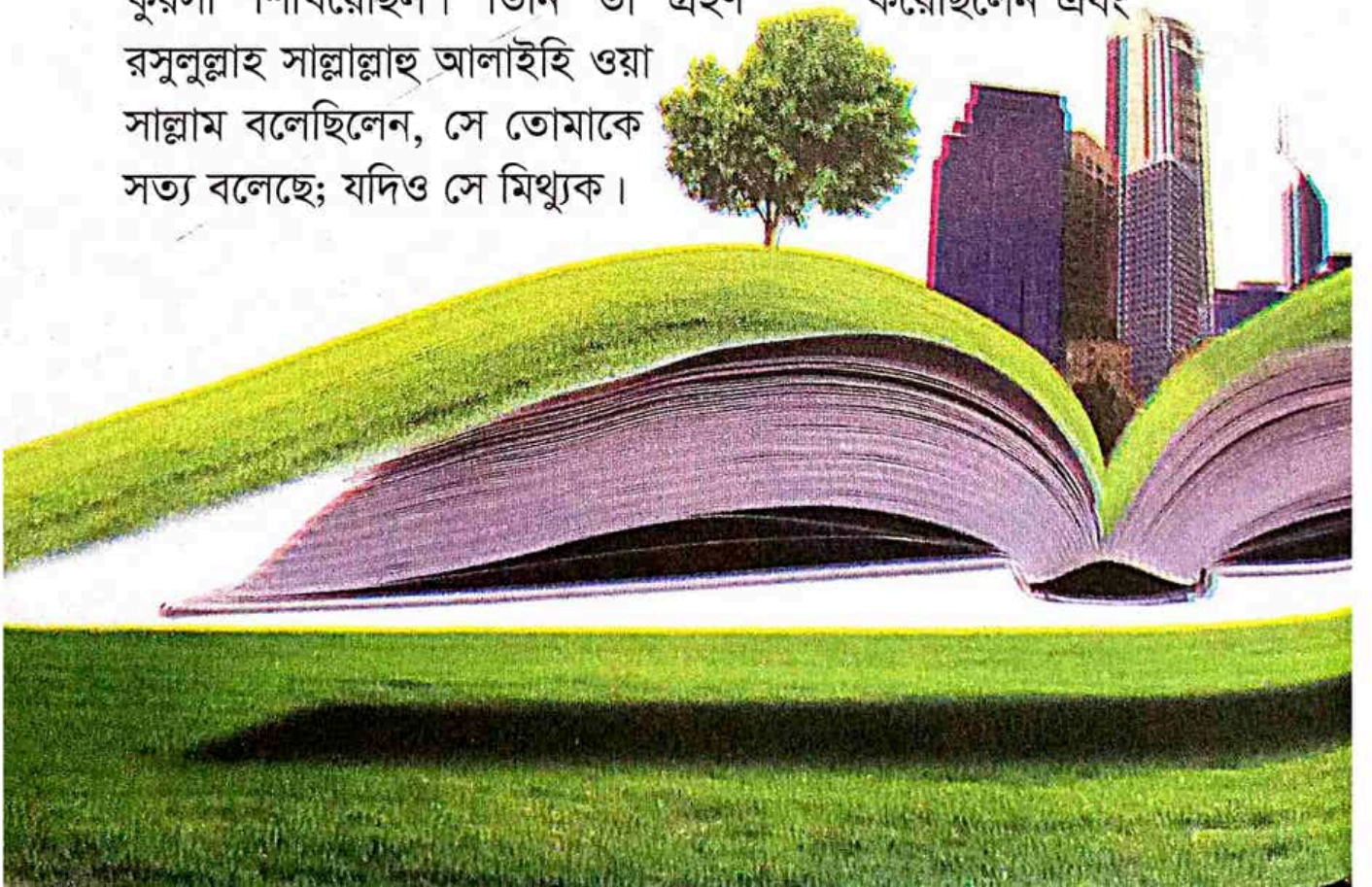
চকচকে তালেবে ইলম

ইসলাম নোংরা অবস্থা সমর্থন করে না। ইসলাম হচ্ছে সৌন্দর্য ও পরিপাটিতার ধর্ম। কেন যে কিছু কিছু মানুষ কাপড়চোপড়ে কদর্যতা ও মলিনতা বরদাশ্ত করে, তা বোধগম্য নয়। নোংরা কাপড়চোপড় তারা পরিধান করে এবং পরিচ্ছন্নতা, উজ্জ্বলতা ও অবয়বের সৌন্দর্য এড়িয়ে চলে।

সাবানের একটি চাকার দাম এক রিয়াল। কাপড় আয়রন করতে প্রয়োজন হয় দুই রিয়াল, আর মেসওয়াকের দাম এক রিয়াল। তা হলে আমরা কেন কিছু কিছু দরবেশের জীবনচরিত গ্রহণ করি এবং মুহাম্মাদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস-সালামের জীবনচরিত ছেড়ে দিই?

তালেবে ইলমের প্রফুল্লতা

তালেবে ইলম হচ্ছে সদা প্রফুল্ল; হাস্যোজ্জ্বল; নম্রতা ও চরিতমাধুর্যে বিগলিত। কঠোরতা ও রূঢ়তা হচ্ছে বেদুইন পাষণ্ড ও বর্বর সিপাইদের খাসলত। [কুরআনে এসেছে] আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাদের জন্য নরম হয়ে গেলে। যদি তুমি রূঢ় ও পাষাণহৃদয় হতে, তা হলে তারা তোমার আশপাশ থেকে চলে যেত।
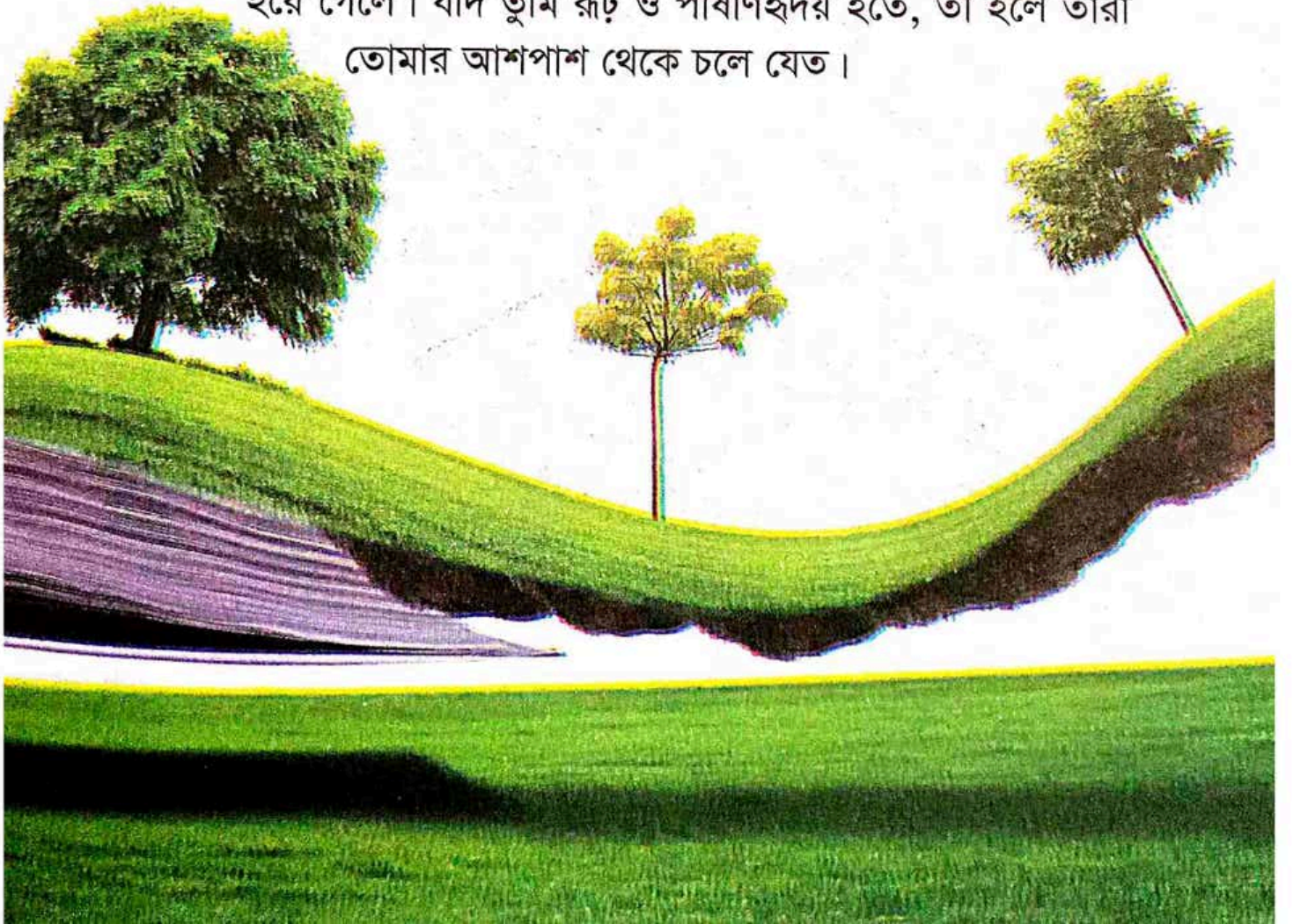
ইলমের উদ্দেশ্য আমল

ওই তালেবে ইলম আলেমে বাআমল কীভাবে হতে পারে, যে কুরআন ও হাদীসের খেলাফ কাজ করে। কোন তালেবে ইলম কি গান শুনতে পারে এবং খেলোয়াড় ও তামাশাকারীদের পাশে বসে থাকতে পারে? সে কি তালেবে ইলম, যে স্বর্ণের আংটি পরে, দাড়ি মুণ্ডন করে, গোড়ালির নীচে কাপড় পরিধান করে, অথবা পরিবারের পর্দার ব্যাপারে অবহেলা করে? এ রকম আরও কতকিছু। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে ইলম অনুযায়ী আমল এবং এর উপর তাঁর সাহায্য কামনা করি।

সর্বোত্তম ইলম

আল্লাহ তাআলার কিতাব ও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের পর সর্বোত্তম ইলম হচ্ছে দলিলভিত্তিক ইলমে ফেকাহ। সমস্ত মানুষ এই ইলমে ফেকাহ'র মুখাপেক্ষী।
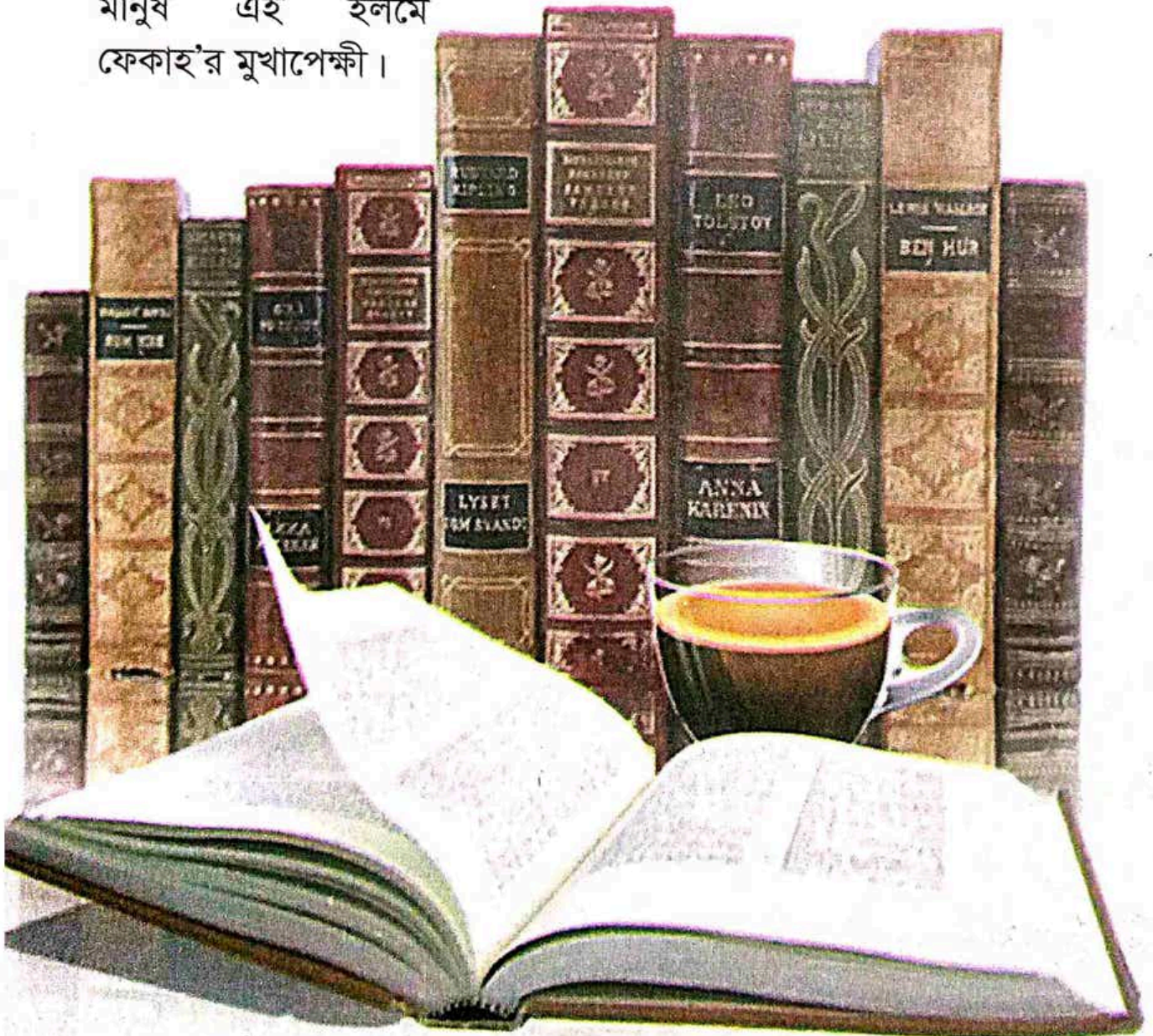
এই ইলম হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের মর্যাদা। সুতরাং হে তালেবে ইলম! তুমি এই বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করো, যাতে প্রতিদান ও সুনাম লাভ হয়।

তালেবে ইলম যে ভুলটি করে থাকে

কোন কোন তালেবে ইলম বিভিন্ন গদ্যপদ্য মুখস্থ করতে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহর কিতাব হিফয করার কথা ভুলে যায়। এসব গদ্যপদ্য তাদের কী উপকার করবে, যখন তাদের কুরআন ইয়াদ নেই।

যে ব্যক্তি কুরআন হিফয করে, কুরআন তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, তাকে সন্তুষ্ট করে দেয়। আর যে ব্যক্তি কুরআন বাদে অন্যকিছু মুখস্থ করে, তা যা-ই হোক না কেন, কুরআনের প্রয়োজন মেটাতে পারে না।

অধিক সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ নয়

তুমি বড় কোন আলেমকে দেখবে, তাঁর ঘরে দশের বেশি গ্রন্থ নেই, যেগুলো তিনি হজম করেছেন এবং বুঝেছেন।

আবার ইলম বঞ্চিত এক আলেমকে দেখবে, তার ঘরে বিশাল গ্রন্থাগার আছে; কিন্তু তিনি কয়েকটি কিতাবের কিছু শিরোনাম বাদে আর কিছু জানেন না। সুতরাং ভিতরের বিষয় অনুধাবন না করে কিতাবের সংখ্যা বাড়ালে কোন লাভ নেই।

হাদীস অন্বেষণের বিভিন্ন স্তর

হাদীস শিক্ষার তিনটি স্তর রয়েছে–

প্রথম স্তর

হাদীসের সংক্ষিপ্ত কিতাব অধ্যয়ন। যেমন–

০১. মুখতাসার সহীহুল বুখারী [যাইনুদ্দীন আহমাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবদুল লতীফ ইবনে আবু বকর যাবীদী, ইয়ামানী, হানাফী [৮১১-৮৯৩ হি.] সহীহ বুখারী'র সনদ, দ্বিরুক্তি ও সনদহীন বাণীসমূহ ছেড়ে দিয়ে একটি সংকলন তৈরী করেন। আলেমসমাজে কিতাবটি 'মুখতাসার সহীহ বুখারী' নামে পরিচিত।]

০২. মুখতাসার সহীহ মুসলিম [যাকিউদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আবদুল আযীম ইবনে আবদুল ক্বাবী আলমুনযেরী রহ. [৫৮১-৬৫৬ হি.] কর্তৃক সংক্ষেপিত সহীহ মুসলিম।]

এগুলো অধ্যয়ন করলে হাদীসের মুতুনের উপর তালেবে ইলমের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় স্তর

হাদীসের মূল কিতাব অধ্যয়ন। যেমন–

০১.সহীহ বুখারী

০২.সহীহ মুসলিম,

০৩.সুনান [যেসব হাদীসের কিতাব ফেকাহ'র বিন্যাস অনুসারে সংকলিত হয়েছে, সেগুলোকে সুনান বলে। যেমন, সুনানুন নাসায়ী, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত তিরমিযী, সুনান ইবনে মাজাহ, সুনানুদ দারেমী, সুনানুদ দারাকুতনী, সুনানুল বায়হাকী ইত্যাদি।]

০৪.ও মুসনাদ [বর্ণনাকারী সাহাবীদের ক্রমানুসারে রচিত হাদীসগ্রন্থকে 'মুসনাদ' বলা হয়। এ জাতীয় গ্রন্থসমূহে এক সাহাবীর বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করার পর আরেক সাহাবীর হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়। যেমন, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আবু হানীফা, মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালিসী, মুসনাদুশ শাফেয়ী, মুসনাদুল বায্যার, মুসনাদুল হুমায়দী, মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ ইত্যাদি।]
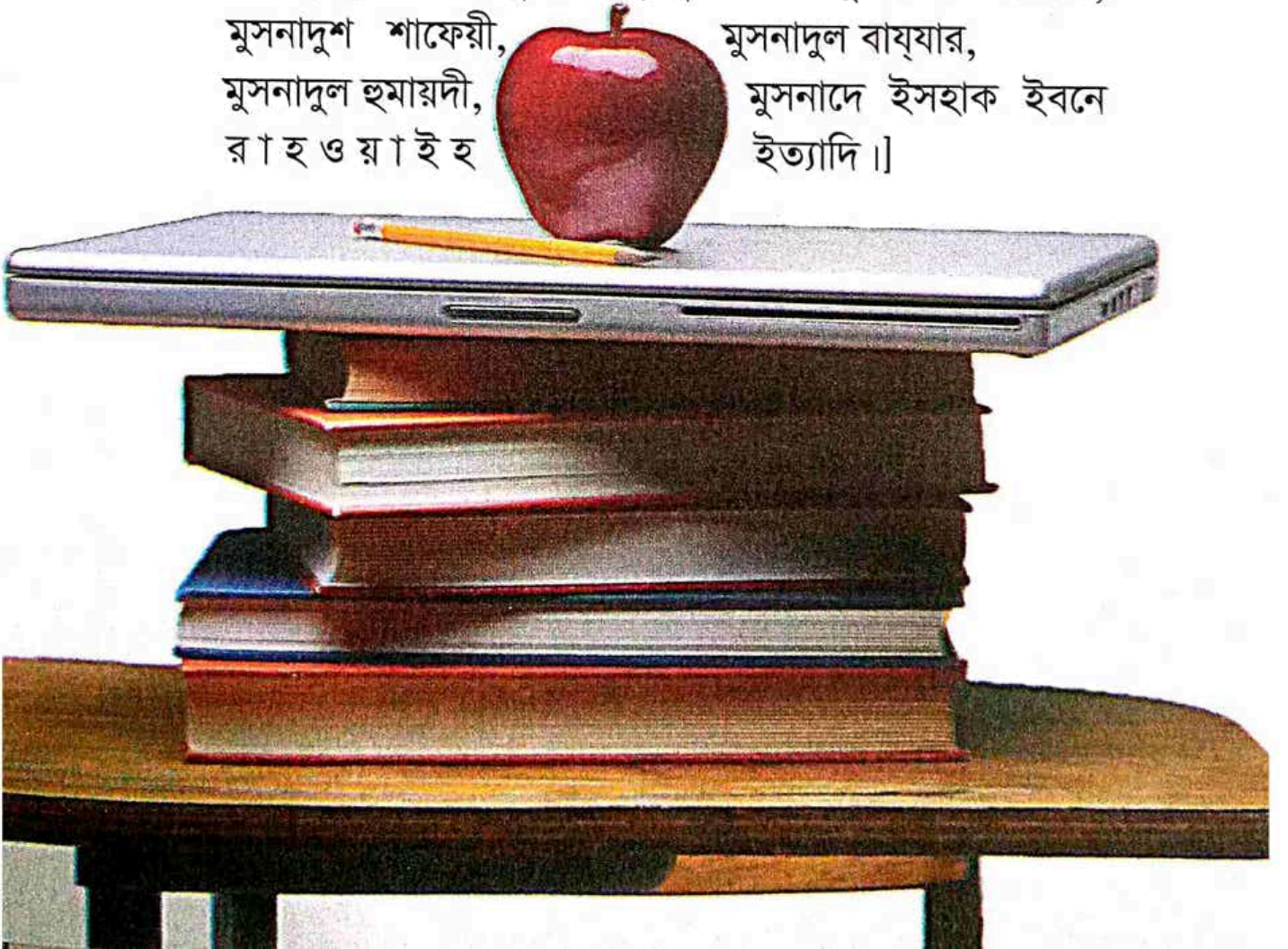
তৃতীয় স্তর

হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ অধ্যয়ন। যেমন–

০১. ফাতহুল বারী,

০২. আলমিনহাজ [মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহ্য়া ইবনে শারফ নববী শাফেয়ী [৬৩১-৬৭৬ হি.] রচিত সহীহ মুসলিমের সবচেয়ে বিখ্যাত ও সমাদৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ।]

০৩. তুহফাতুল আহওয়াযী ইত্যাদি। [আবদুর রহমান মুবারকপুরী হিন্দী [?-১৩৫৩ হি.] রচিত সুনানুত তিরমিযী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ।]

মূল্যবান ভাণ্ডার

যখন তুমি কোন বিষয়বস্তু প্রস্তুত করবে, অথবা কোন গবেষণাপত্র তৈরী করবে, তখন তার কাগজগুলো সংরক্ষণ করবে। কেননা, একসময় তোমার খুব প্রয়োজন হবে, তখন নিজের কাগজের দিকে ফিরতে পারবে। কতই না ভালো হয়, যদি তোমার গবেষণা, সংযোজন ও সূচির জন্য আলাদা আলাদা ড্রয়ার থাকে।

বিশেষ নির্জনতা

তালেবে ইলমের জন্য সময়ে সময়ে নির্জনতা থাকা প্রয়োজন, যেসময় তার দেহ, তার অন্তর ও তার মস্তিষ্ক বিশ্রাম করবে; তার রবের সাথে যোগাযোগ হবে এবং এই নির্জনতার মধ্যে কিতাবাদি অধ্যয়ন করবে। তা হলে মানুষের সাথে মেশার জন্য উদ্যম সৃষ্টি হবে।

তালেবে ইলমের লেবাস

সাদা পরিচ্ছন্ন লেবাস হচ্ছে সর্বোত্তম। পাতলা ও মেয়েলী পোশাক এবং ভিক্ষুক ও চালকশ্রেণির লেবাস বর্জন করো। তোমার পোশাক হওয়া চাই মধ্যম ও মানানসই। খোশবু, মেসওয়াক ও ইসলামী খাসলত অবলম্বন করো। যেমন, দাড়ি লম্বা এবং গোঁফ খাটো করা। এমন আরও যাকিছু আছে।

বিচ্ছিন্ন হয়ো না

নবী আলাহিস সালাম থেকে বর্ণিত আছে, 'বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি দূরত্ব পাড়ি দিতে পারে না, কোন বাহনও অবশিষ্ট রাখতে পারে না।' হে তালেবে ইলম! তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পোড়ো না। অর্থাৎ নিজেকে ক্লান্ত শ্রান্ত করে ফেলো না। তা হলে তুমি বিরক্ত হয়ে পড়বে। অতিরিক্ত মুখস্থকরণ এবং অতিরিক্ত অধ্যয়ন মানুষকে ক্লান্ত করে তোলে। তবে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, তা হলে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে।

হিফযের সহায়ক ওষুধ

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, কিশমিশ খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। তাঁরা আরও বলেছেন, বেগুন খেলে স্মরণশক্তি হ্রাস পায়। আমরা বলি, কিশমিশ ও বেগুনের কথা বাদ দাও, হিফযের উপর সবচেয়ে সাহায্য করে যেটা; তা হল আল্লাহ তাআলার ভয়– তাকওয়া। আল্লাহকে ভয় করো; তিনি তোমাদেরকে ইলম দিবেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন–

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي
فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ المَعَاصِي
وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ العِلْمَ نُورٌ
وَنُورُ اللهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي

আমি (উস্তাদ) অকী'র কাছে খারাপ স্মরণশক্তির অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে গুনাহ বর্জন করার নির্দেশনা দিলেন।

তিনি আমাকে জানালেন যে, ইলম হচ্ছে নূর। আর আল্লাহ'র নূর কোন গুনাহগার ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় না।

সব পাঠক উপকার গ্রহণ করে না

এমন লোক পাওয়া যায়, যারা উপলব্ধির সাথে পড়তে থাকে; কিন্তু এমনসব বিষয়ে, যেগুলো কোন উপকার করে না, অথবা এমনসব বিষয়, যেগুলোর চেয়ে অন্য বিষয় অনেক বেশি উপকারী। যেমন, কোন ব্যক্তি দিনরাত শুধু পত্র-পত্রিকা পড়ায় লিপ্ত থাকে; অথবা মনস্তাত্ত্বিক গ্রন্থাবলি পড়ায় লিপ্ত থাকে। তার কামনা-বাসনা একটিই। এমন ব্যক্তিরা অচিরেই জানতে পারবে যে, তাদের হাতে কিছুই নেই। কেননা, ইলম এক জিনিস, আর পেঁচাল আরেক জিনিস।

তালেবে ইলম অন্যকে ওয়াজ করায় ব্যস্ত

মানুষকে বিরক্ত করা, ওয়াজ ও দরসের মাধ্যমে তাদেরকে তিক্ত করা একটি ঘৃণা সৃষ্টিকারী কাজ। সুতরাং হে তালেবে ইলম! প্রতি সপ্তাহে যেন তোমার একটি বা দুটির বেশি দরস ও মাহফিল না হয়। ফিকির করো সুন্দর উপস্থান, পরিবেশনা ও উপস্থিতির।

সমালোচনার সময় নাম বলতে সতর্ক হও

সমালোচনা ও প্রতিবাদের ক্ষেত্রে ফেতনা-ফাসাদ ও মানহানীর আশঙ্কা এড়ানোর জন্য বক্তৃতার সময় আলেমদের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত নয়; বরং অস্পষ্ট ও ইশারার উপর ক্ষান্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
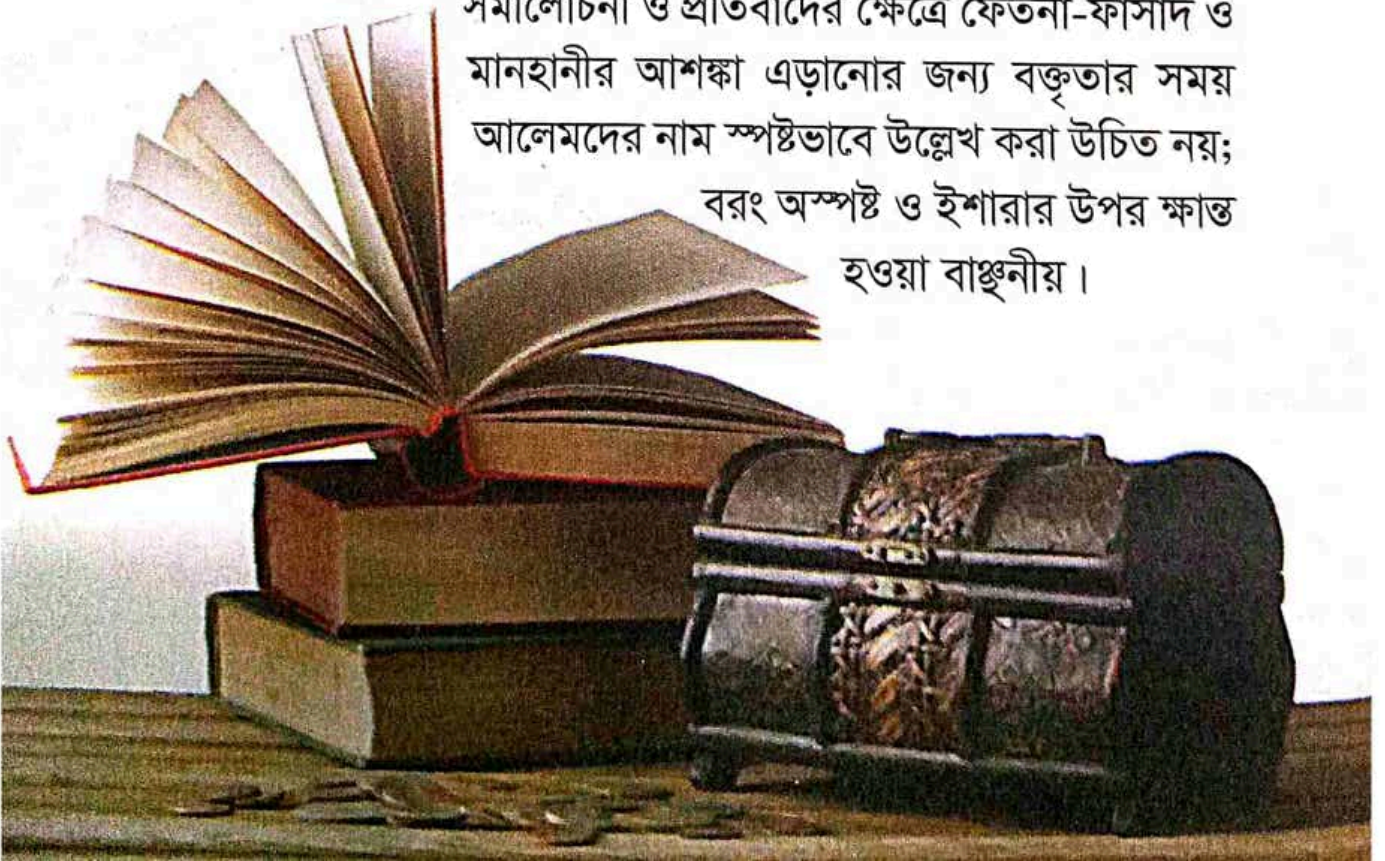
গুনাহগার মুসলমানের নাম উল্লেখ করা অনুচিত

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন ব্যক্তির ত্রুটি সংশোধন করতে মনস্থ করতেন, তখন বলতেন, 'কিছু লোকের কী হয়েছে, তারা এমন এমন করছে?'

সুতরাং দাঈ ও তালেবে ইলমের জন্য উচিত জনসম্মুখে গুনাহগার মুসলমানদের নাম উল্লেখ না করা। যেমন, কণ্ঠশিল্পী, চলচ্চিত্রকার ও নর্তকীদের নাম। হয়তো আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দিবেন। তিরস্কার না করে, তাদের দোষ গোপন করা বাঞ্ছনীয়।

যারা একাডেমিক পড়াশোনাকে খাটো করে দেখে

অনেক যুবকের মুখে একাডেমিক পড়াশোনার সমালোচনা শুনেছি। তারা একাডেমিক পড়াশোনার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। তাদের যুক্তি এতে বরকত কম; প্রাপ্তি কম; সময়ের অপচয় বেশি।

আমি বিষয়টি যাচাই করেছি। দেখেছি, মেধাবী শিক্ষানবিস, সমাজের কর্মঠ ব্যক্তি ও ময়দানের বীর– তাদের বেশিরভাগ; বরং সবই একাডেমিক পড়াশোনার সন্তান।

সুতরাং তাদের কথা সঠিক নয়। একাডেমিক ও ব্যক্তিগত পড়াশোনা যদি একত্র হয়, তা হলে কতই না সুন্দর।
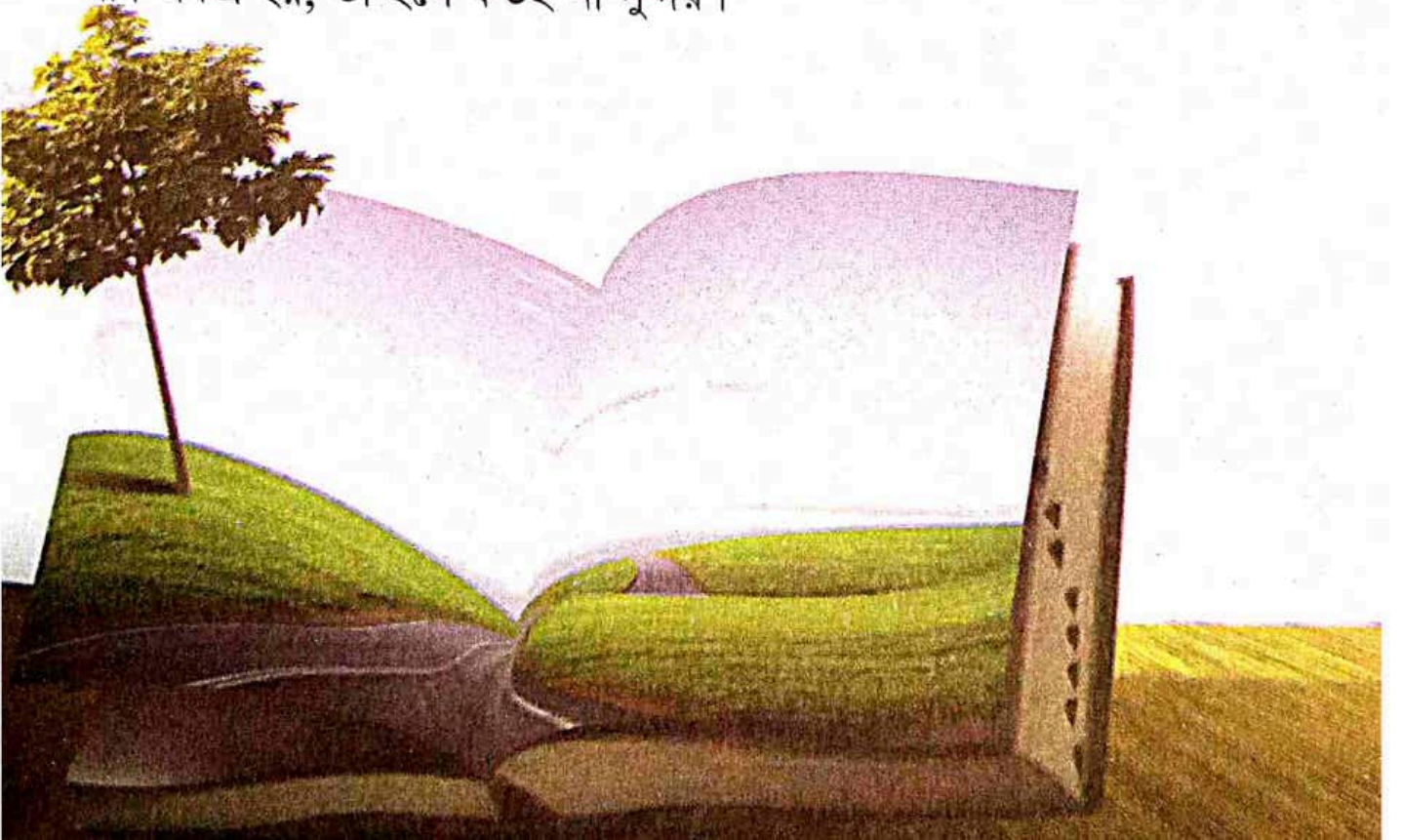
ইলমের মানহানীকারীর কথা শ্রবণ করবে না

দাওয়াতের দোহাই দিয়ে যে ব্যক্তি তোমাকে ইলম তলব থেকে সরিয়ে দিতে চায়, দেখবে সে তোমাকে বলছে, আমাদের দাঈ প্রয়োজন; আলেমের প্রয়োজন নেই। যদি এমন কথা কাউকে বলতে শোন, তা হলে তাকে খুব মজবুত করে ধরো এবং আয়াতুল কুরসী পাঠ করো। এই আয়াতের মধ্যে তোমার দলিল আছে।

মৌলিক বিষয়বস্তু

মৌলিক বিষয়বস্তু হচ্ছে তিনটি– তাফসীর, ফেকাহ ও হাদীস। এ ছাড়া আর যেসব বিষয় আছে, সেগুলো সহায়ক। যেমন, উসূলে হাদীস, উসূলে ফেকাহ ও উলূমুল কুরআন ইত্যাদি। সুতরাং অনুসন্ধান, গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য তুমি মৌলিক বিষয়াদিকে অবলম্বন করো।

বর্তমান যামানার সর্বোত্তম সাথি কিতাব

ভাইবেরাদার যদি তোমাকে ত্যাগ করে, বন্ধুবান্ধব যদি তোমার উপর বিরক্ত হয়ে যায়, তা হলে বন্ধুহিসাবে তোমার জন্য কিতাবই যথেষ্ট। কিতাবের সাথে উপবেশন কতই না চমৎকার! কিতাবের সাথে অতিবাহিত সময় কতই না পরিচ্ছন্ন! কিতাবের সাথে কথোপকথন কতই না মজাদার! কিতাবের সঙ্গে তোমার দীর্ঘ বৈঠক হোক, তা হলে পরিপক্ক ফল আর অসংখ্য ফায়দা হাসিল করতে পারবে।
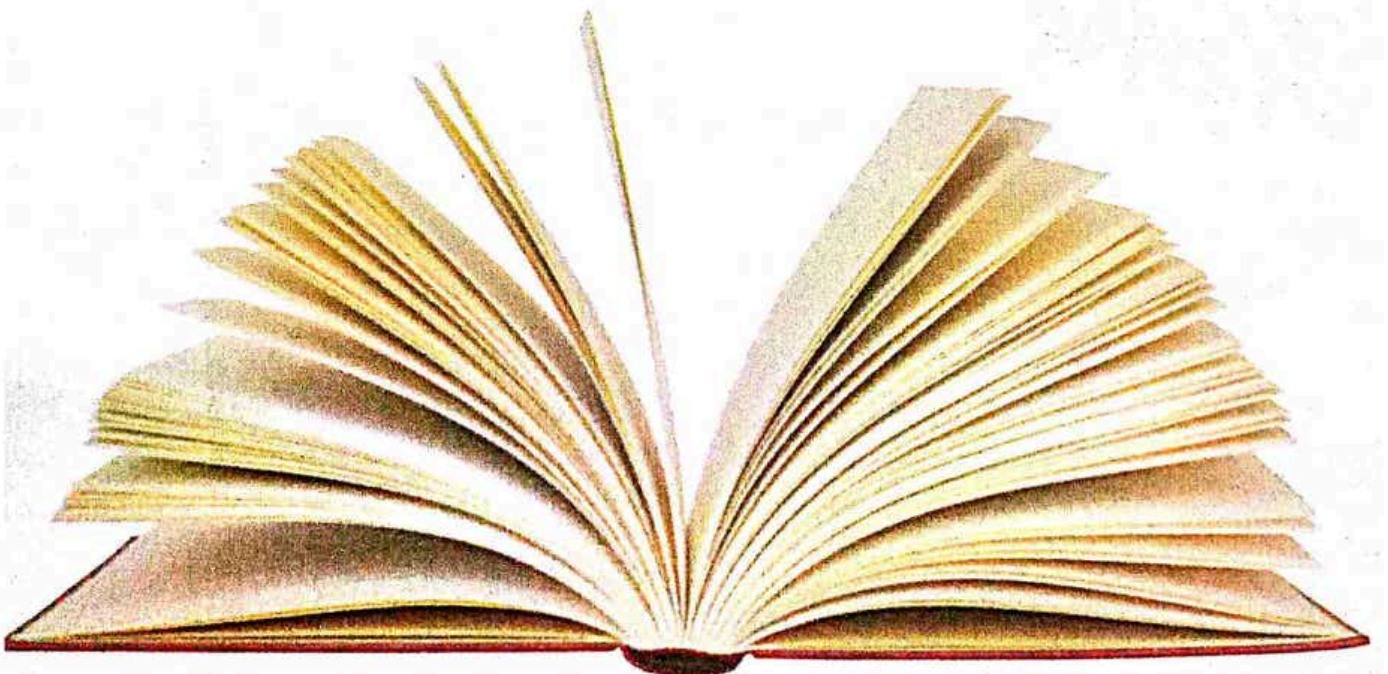
জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস মূল্যায়ন করো

সময়ই জীবন। তালেবে ইলম অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সময় সচেতন। অনর্থক বিতর্ক আর সমাজের খবরা-খবর নিয়ে যে ব্যক্তি সময় অপচয় করে, সে আর যা-ই হোক, আলেম নয়। যে ব্যক্তি অন্যকে সতর্ক করে, তাকে সাধারণত ক্ষমা করা হয়ে থাকে।

সবর ও অধ্যবসায়

একজন খুব চমৎকার বলেছেন–

اصْبِرْ وَلَا تَضْجَرْ مِن مَّطْلَبِ   فَآفَةُ الطَّالِبِ أَن يَّضْــــجَرَا
أَمَا تَرَى الْحَبْلَ بِطُولِ الْمَدَى   صَلِيــــــبِ الصَّخْرِ قَدْ أَثَّرَا

সবর করো। কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে বিরক্ত হয়ো না। কেননা, তালেবে ইলমের আপদ হচ্ছে বিরক্তি।

তুমি কি দেখতে পাও না যে, দীর্ঘ অধ্যবসায়ের জোরে রশিও পাষাণ পাথরের বুকে রেখা সৃষ্টি করে।

আচানক তলব হলে

কোনো মজলিস, মাহফিল, সেমিনার বা হালকায় কোন তালেবে ইলমের কাছে যদি আচানক কথাবার্তা বলার জন্য নির্দেশ বা অনুরোধ করা হয়, তা হলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পর তার জন্য করণীয় দুটি–

০১. স্থান, কাল, পাত্র ও কথার খেই বিবেচনা করা।

০২. এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, যে সম্পর্কে আগে কখনও সে আলোচনা করেছে; রপ্ত করেছে এবং খুব ভালো করে বুঝে নিয়েছে। যদিও বিষয়টি পুনরোক্ত হোক না কেন।

মজলিসে আধিপত্য বিস্তার উচিত নয়

কোনো কোনো তালেবে ইলম মজলিসের সাথিসঙ্গীকে এড়িয়ে নিজেই কথাবার্তা বলতে থাকে। অন্যদেরকে নির্দিষ্ট সময় ছাড়া কথাবার্তা বলতে দেয় না; কিন্তু নিজে সুযোগ নিয়ে বলতেই থাকে। এই খাসলত অত্যন্ত নিন্দনীয়।

তালেবে ইলম কল্যাণের ইমাম

কুরআন মাজীদে আছে, 'আমাদেরকে তুমি মুত্তাকীদের ইমাম নিযুক্ত করো।' [সুরা ফুরকান: ৭৪] আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আমরা অন্যদের এক্তেদা করব; আর অন্যরা আমাদের এক্তেদা করবে। এই ইমামতের দাবী হচ্ছে যে, তালেবে ইলম মসজিদের প্রথম কাতারে সালাত পড়বে, সুন্নত ও নফলের পাবন্দী করবে এবং বিভিন্ন নেক কাজে প্রতিযোগিতা করবে। সমাজের বিপদ কেমন হতে পারে, যদি তালেবে ইলম বাসায় সালাত পড়ে অথবা ফজরের সালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকে? অন্যান্য ব্যাপারেও একই কথা।
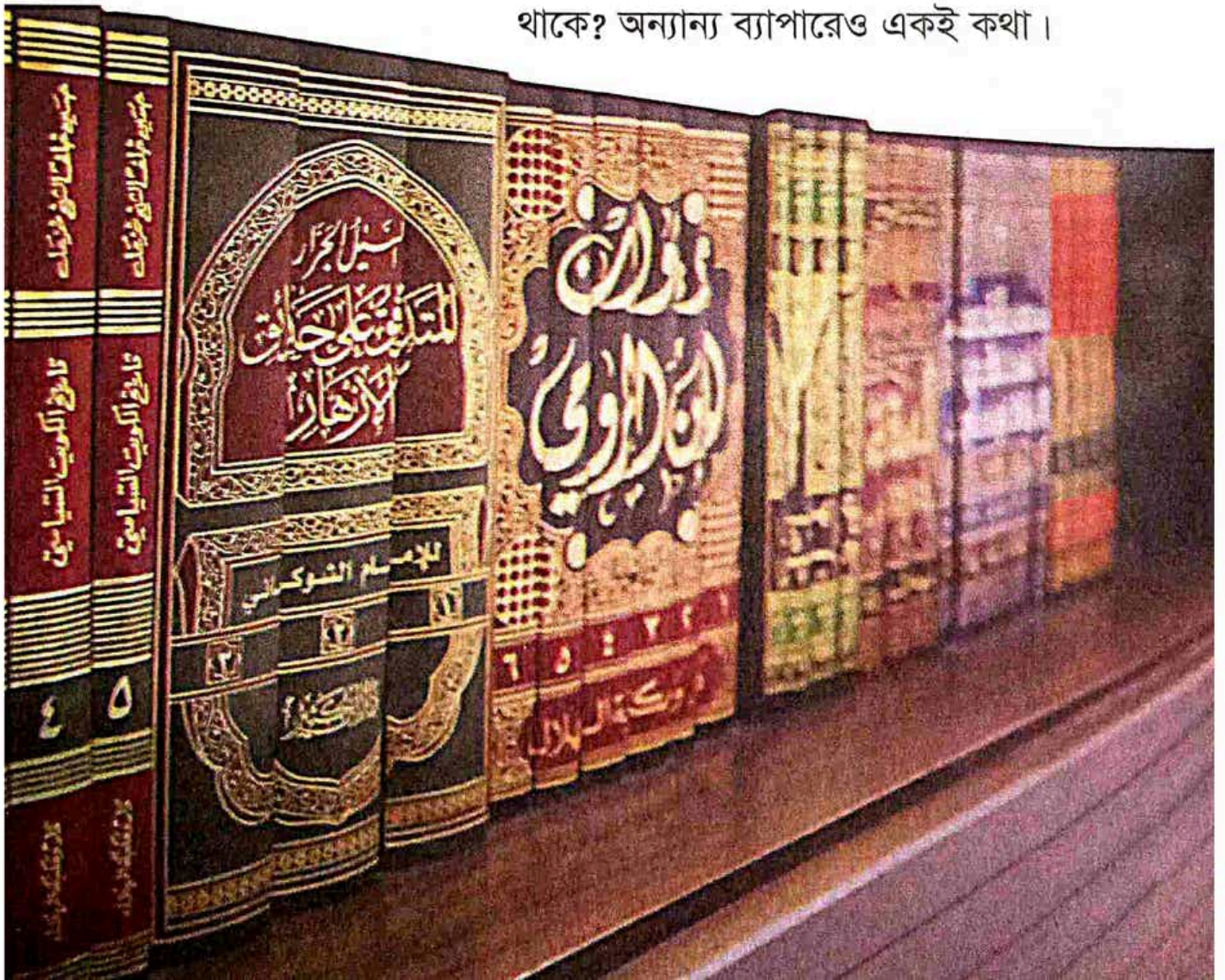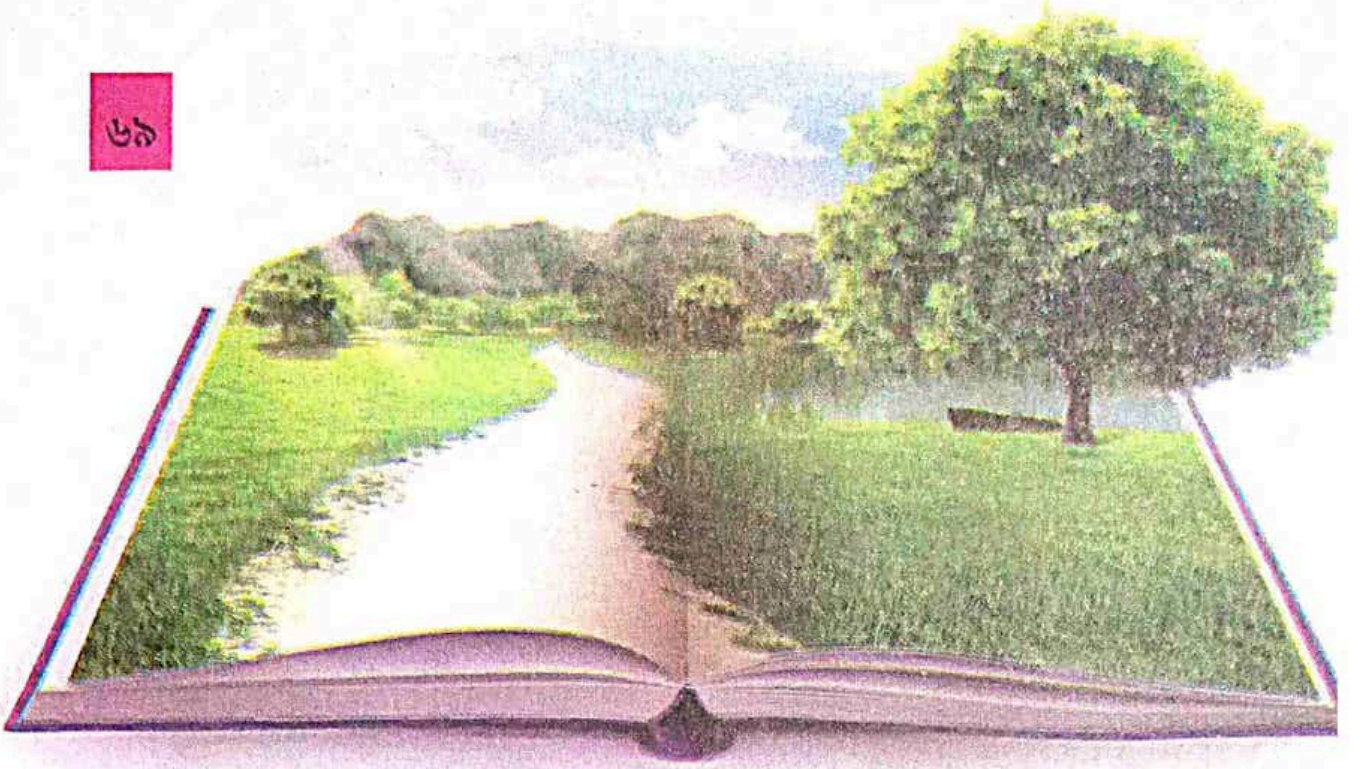
দুই চোখে প্রত্যক্ষ করো

উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন, ফেকাহ বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি হাদীস নিয়ে ক্ষান্ত হয়, অথবা হাদীস বাদ দিয়ে শুধু ফেকাহর উপর সন্তুষ্ট থাকে, সে এক চোখের অধিকারী ব্যক্তির মত, যে অপর চোখ দিয়ে কিছুই দেখতে পায় না। যে ব্যক্তি এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় করে, সে সুস্থ দুই চোখের অধিকারী ব্যক্তির মত। আর যে ব্যক্তি এই দুই থেকেই বঞ্চিত, সে অন্ধ।

যদি সঙ্কটে নিপতিত হও

কোনো মাসআলা যদি জটিল হয়ে পড়ে, অথবা কোন বিচার মুশকিল মনে হয়, তা হলে তোমার কর্তব্য চিরঞ্জীব ও তত্ত্বাবধায়ক আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক পরিমাণে দোআ করা। তিনি ছাড়া আর কেউ সঙ্কট দূর করতে পারে না; তিনি বাদে অন্যকেউ গিট খুলতে পারে না। কুরআনে আছে, 'বিপদগ্রস্তকে কে সাড়া দেন, যখন সে ডাকে?'

[সূরা নাম্‌ল: ৬২]

পকেট খাতা

কোনো কোনো তালেবে ইলম সবসময় নোটখাতা সাথে রাখে। কোনো ফায়দা, হেকমত, হাদীস, কবিতা বা চুটকি শুনলেই তারা লিখে ফেলে এবং মুখস্থ করে নেয়। এই আমল অব্যাহত থাকলে খুব তাড়াতাড়ি এরা

জ্ঞান ও তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে পারবে।

খুতবা ও ইমামত এড়ানো উচিত নয়

সুনাম ও সুখ্যাতির ভয়ে ইমাম ও জুমার খতীবের পদ এড়িয়ে চলে অনেক তালেবে ইলম। এ হচ্ছে এক প্রকারের ধোঁকা। কেননা, যখন তালেবে ইলম ইখলাসের সাথে নেতৃত্ব দেয়, তখনই সে উপকৃত হয়, মুখস্থ করতে পারে এবং সাবধান হতে পারে। আল্লাহ তাআলার সাহায্যের পর ইমাম ও খতীবের যিম্মাদারী তালেবে ইলমের হিফয, উপলব্ধি, সাহস ও জ্ঞানের প্রশস্ততা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। তা ছাড়া এই দুটি যিম্মাদারী সমস্ত এবাদতবন্দেগীর সরদার। কেননা, মুহাম্মাদ আলাইহিস সালাম সবসময় ইমাম ও খতীব ছিলেন।

تَقَدَّمَ فِيهِم شَهْمًا إِمَامًا وَلَوْلَاهُ لَمَا رَكِبُوا وَرَاءَه

তিনি তাদের সামনে অবস্থান করেন নেতা ও ইমাম হিসেবে; অন্যথায় লোকজন তাঁকে অনুসরণ করত না।

আচার-ব্যবহারের আদব

আচার-ব্যবহারে তালেবে ইলমের প্রজ্ঞা ও আদবের পরিচয় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি ভাইবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়, তা হলে মোনাসিব সময়ে করবে। যদি তাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে হয়, তা হলে সময় বুঝে যোগাযোগ করবে। সেই তালেবে ইলমের ব্যাপারে তোমার কী অভিমত, যে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে রাতের
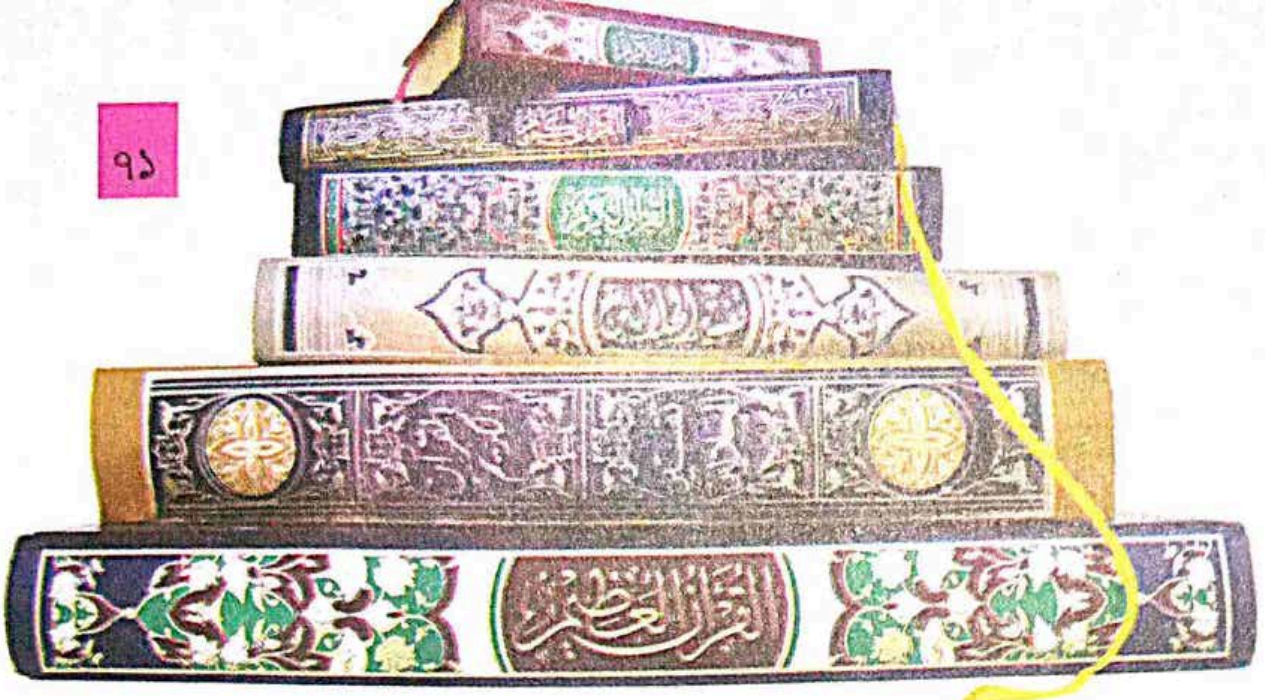
শেষ ভাগে, ফজরের পরে অথবা দুপুরে বিশ্রামের সময়। এগুলো কি কথা বলা ও যোগাযোগের সময়?

পরিপূর্ণ আলেম

শরীয়ত তথা কুরআন-সুন্নাহর উক্তি আর পূর্ববর্তীদের বক্তব্য উপলব্ধি করার পর যে ব্যক্তি চলমান যুগের অবস্থা উপলব্ধি করে এবং শরীয়তের উক্তি বর্তমান অবস্থার সাথে ফিট করে, সে হচ্ছে পরিপূর্ণ আলেম। যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের সমাধান ছাড়া শুধু যামানার হাল উপলব্ধি করে, সে ওই ব্যক্তির মত, যে রোগ ধরতে পারে; কিন্তু তার কাছে চিকিৎসা নেই। আর যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের সমাধান জানে; তবে যামানার পরিস্থিতি জানে না, সে হচ্ছে ওই ব্যক্তির মত, যার চিকিৎসা জানা আছে; কিন্তু রোগ ধরার যোগ্যতা নেই।

فَكُنْ رَجُلًا رِجْلُهُ فِي الثَّرَى   وَهَامَةُ هِمَّتِهِ فِي الثُّرَيَّا

সুতরাং তুমি এমন ব্যক্তিতে পরিণত হও, যার পা থাকে জমীনে; কিন্তু হিম্মতের শির থাকে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জে।

অন্যের ব্যক্তিত্ব পরিধান কোরো না

কিছু কিছু মানুষ দ্রুত গলে যায়। তারা অনুকরণ প্রিয়। তাপে গলে যায় এবং ঠান্ডায় জড়োসড়ো হয়ে পড়ে। এদের কাছে কোন ব্যক্তিকে ভালো লাগলে তার ওঠা-বসা, হাসি-কান্না, শয়ন-জাগরণ সবকিছুতে অনুকরণ শুরু করে দেয়। এটা দৃঢ়তার অবক্ষয় ও ব্যক্তিত্বের শূন্যতার দলিল।

প্রকৃত ব্যক্তিত্বের অধিকারী সে, যে দৃঢ়তা ও মনোবল গ্রহণ করে নেককার লোকজন থেকে– বদান্যতা, সবর, সহনশীলতা ও বীরত্বের ক্ষেত্রে। আর বর্জন করে ওইসব লোককে, যাদের অনুকরণে কোন ফায়দা নেই।

ইবনে হযমের কিতাব মুহাল্লা

আমি এমন লোক দেখেছি, যিনি তাঁর ছাত্রদেরকে ইবনে হযমের মুহাল্লা পড়ার ব্যাপারে সাবধান করে থাকেন। আমি এই সতর্কীকরণের দুটি কারণ খুঁজে পাই–

(ক) এই সতর্ককারী কট্টরপন্থী মুকাল্লিদ। মাযহাবের তাকলীদ থেকে চোখের পলকের জন্য বের হওয়াও বৈধ মনে করেন না। তার দৃষ্টিতে ইবনে হযম এই পন্থার দুশমন।

(খ) অথবা এই সতর্ককারী ব্যক্তি মুহাল্লা পড়েননি; মুহাল্লা খুলবার সুযোগ পাননি।

একথা সত্য যে, মুহাল্লার মধ্যে [আল্লাহ তাআলার] সিফাত সম্পর্কে, আলেমদের সমালোচনা প্রসঙ্গে এবং আরও কিছু মাসআলার ব্যাপারে এমন মন্তব্য আছে, যা কিয়াস ও তাবীলের মাপকাঠিতে খাপ খায় না; কিন্তু মুহাল্লার মৌলিক ইলম, দলিল ও উদ্ধৃতির ভাণ্ডার যাবে কোথায়? সুতরাং হে তালেবে ইলম! তুমি এই কিতাব থেকে উপকৃত হতে থাকো এবং হতাশ-কারীর বক্তব্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ কোরো না।
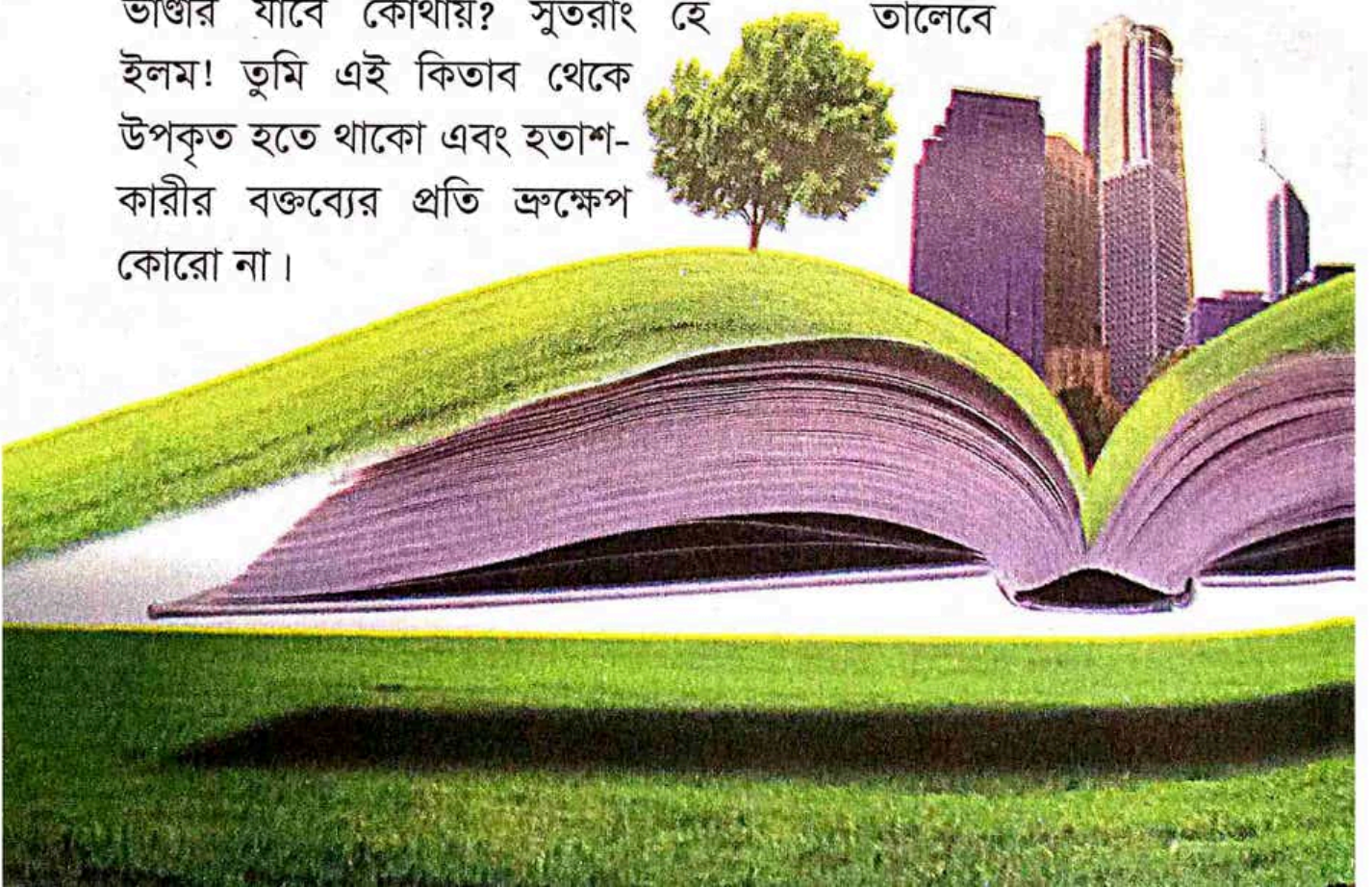
সাইয়েদ কুতুবের ফী যিলালিল কুরআন

এই তাফসীর গ্রন্থে কিছু বিতর্কিত ক্ষেত্র রয়েছে, যেমন [আল্লাহর সিফাত] সম্পর্কিত কিছু ব্যাখ্যা এবং কিছু মন্তব্য। তবে তাফসীর প্রসঙ্গে সবচেয়ে সুন্দর কিতাব। এই সৌন্দর্য লেখকের সততা ও তাঁর এখলাসের প্রমাণ বহন করে। সুতরাং হে তালেবে ইলম! তুমি গ্রন্থটি অধ্যয়ন করো। খতীব ও বক্তাদের জন্য এই গ্রন্থের ভাষ্য খুবই চমৎকার।

মধ্যপন্থা

হে তালেবে ইলম! আমি চাই না যে, তুমি কট্টরপন্থী মুকাল্লিদ হও। কেননা, কট্টরপন্থী মুকাল্লিদ হচ্ছে দৃষ্টিহীন। আবার এটাও চাই না যে, তুমি আলেমদের উপর হামলে পড়ো এবং নিজের মতের উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে বসো। এটাও কাম্য নয়; ওটাও কাম্য নয়। মধ্যপন্থা হচ্ছে দলিল অবলম্বন করে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে উপকৃত হওয়া।

আবশ্যক শর্ত

প্রত্যেক দল কিতাব ও সুন্নাহ আকড়ে থাকার দাবি করে; এমন কি বেদআতীরাও। তবে তাদের ও প্রকৃত আহলে সুন্নতের এই দাবির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে
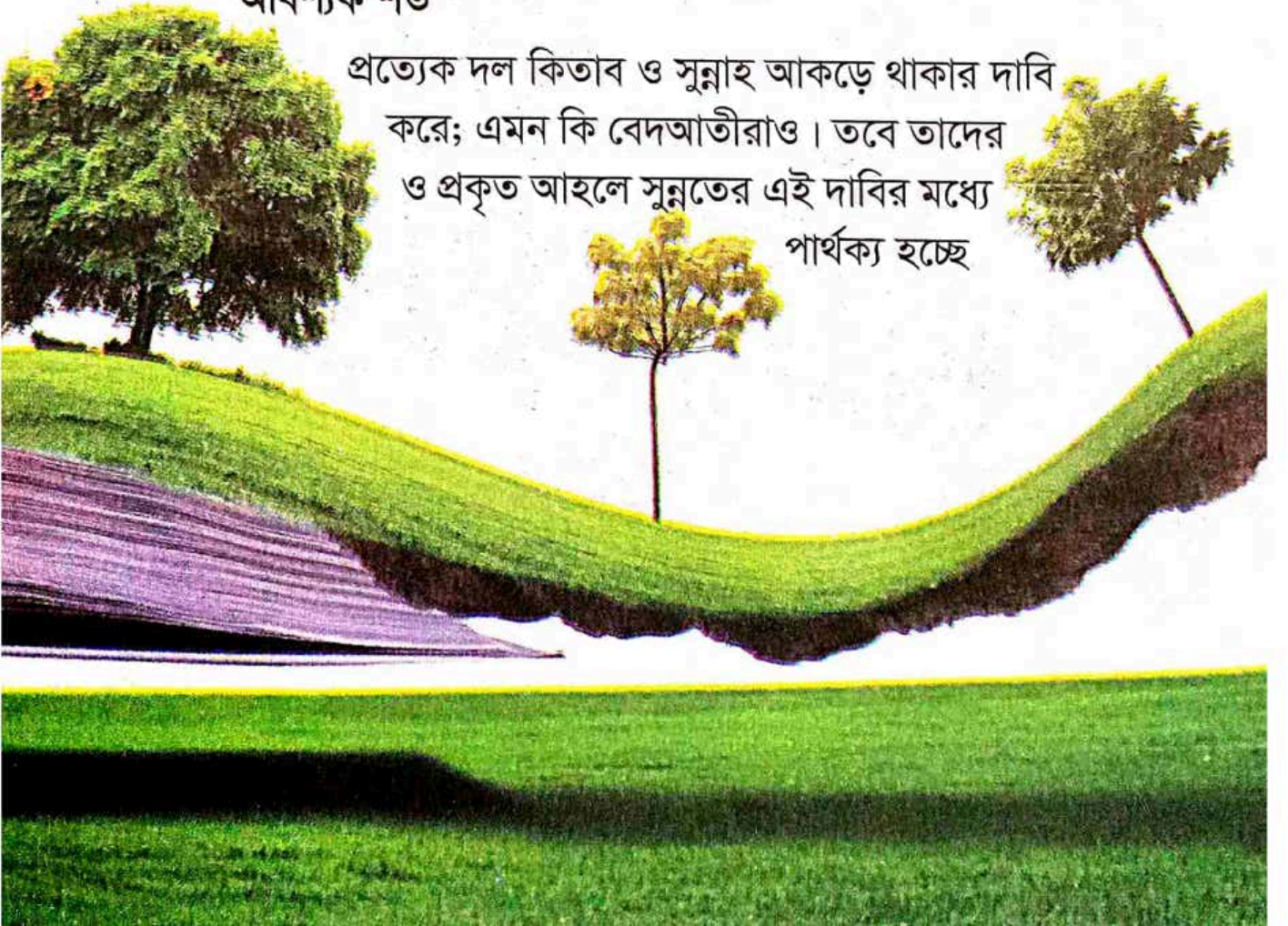
এই যে, আহলে সুন্নত কুরআন-সুন্নাহ আকড়ে থাকে সাহাবা ও পূর্ববর্তীদের পন্থায়। অর্থাৎ তারা কুরআন ও হাদীস যেভাবে বুঝেছিলেন, এরাও ঠিক সেভাবেই বোঝে। এটি একটি বাধ্যতামূলক শর্ত।

উৎকৃষ্ট অভিমত

তালেবে ইলমের অধিক বইপুস্তক রচনায় লিপ্ত হওয়া একই কাজ বারবার করার নামান্তর এবং ইসলামী প্রকাশনা বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু নয়। তালেবে ইলম যদি পূর্ববর্তীদের গ্রন্থাবলি মানুষকে পড়ানো ও বোঝানোর জন্য সময় বের করে, তা হলে খুবই কল্যাণ ও উপকার হবে। যিনি পরীক্ষা করেছেন, তিনি উপলব্ধি করেছেন।

সর্বোত্তম তাফসীরগ্রন্থ

তাফসীরের অনেক কিতাব অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়েছে আমার। দুটি তাফসীরগ্রন্থের মত আর কোন তাফসীর দেখিনি– তাফসীরে ইবনে কাসীর
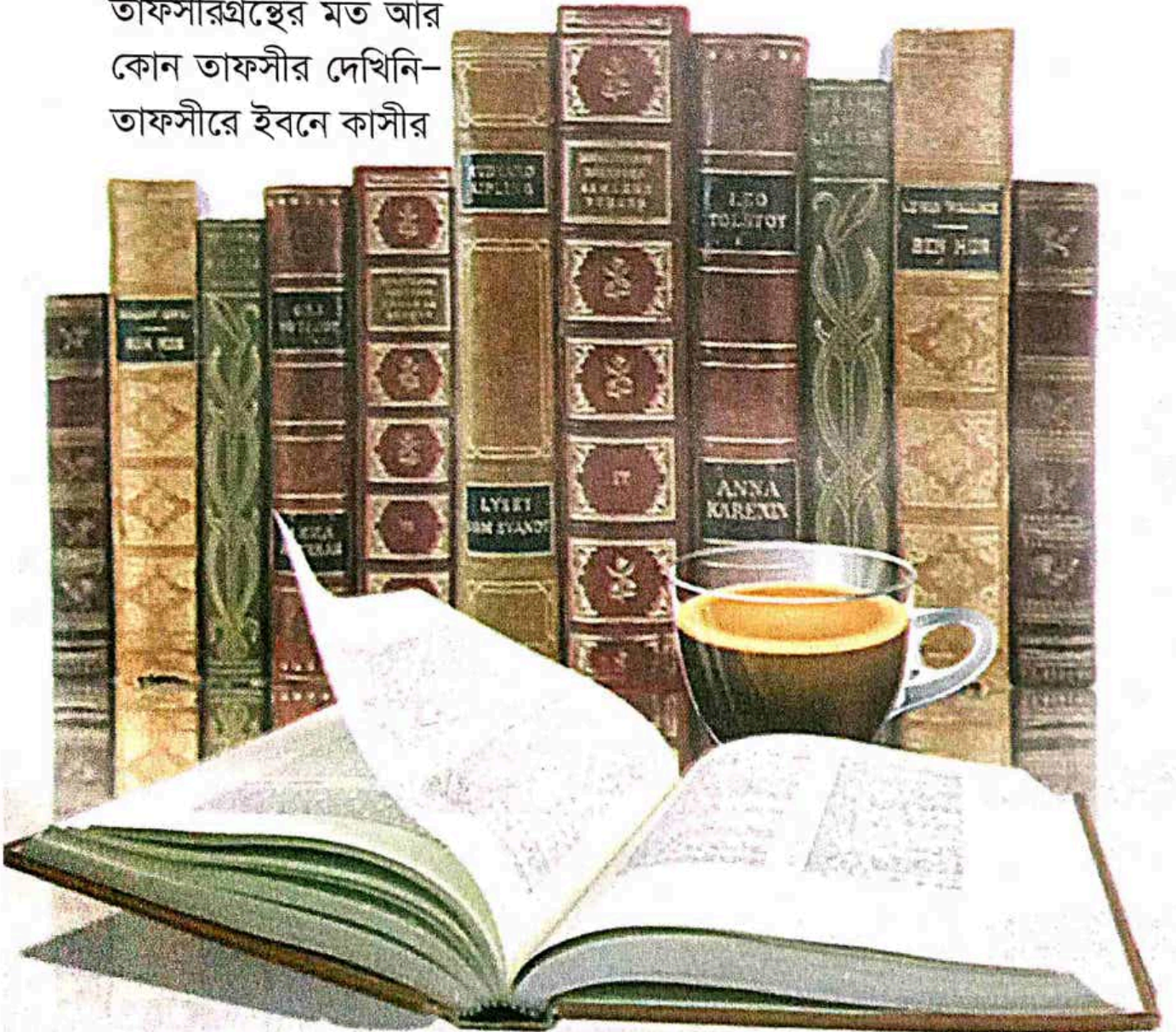
ও তাফসীরে কুর্তুবী [আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আনসারী কুরতুবী [৬০০-৬৭১ হি.] রচিত 'আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন']

তৃতীয়টি হচ্ছে আবদুর রহমান ইবনে নাসের সা'দীর তাফসীর [আবদুর রহমান ইবনে নাসের ইবনে আবদুল্লাহ সা'দী [১৩০৭-১৩৭৬ হি.] রচিত 'তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান'।]

তাফসীরে ইবনে জারীর [আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে গালেব তাবারী [২২৪-৩১০ হি.] রচিত 'জামিউল বায়ান আন তাবীলি আয়িল কুরআন' (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)] খুব দীর্ঘ। এর বেশি অংশ রয়েছে ইবনে কাসীরে।

ফাতহুল কাদীরের [মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ শাওকানী [১১৭৩-১২৫০ হি.] রচিত 'ফাতহুল কাদীর'] বেশি অংশ হচ্ছে ব্যাকরণ বিশ্লেষণ। তবে এতে কিছু সূক্ষ্ম তথ্য আছে।

তাফসীরে খাযেন [আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম বাগদাদী [৬৭৮-৭৪১ হি.] রচিত 'লুবাবুত তাবীল ফী মাআতিত তান-যীল' (لباب التأويل في معاني التنزيل)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ 'আল-খাযেন' নামে ইতিহাসে খ্যাত।] বেদআত ও খারাফাতে টইটম্বুর।

তাফসীরে রাযী [ফখরুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে উমর ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন রাযী [৫৪৪-৬০৬ হি.] রচিত 'মাফতীহুল গায়ব']। অনেক লম্বা। লেখক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করেন এবং দুর্বল তথ্য পরিবেশন করেন।

যাদুল মাসীর [হাফেয জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী [৫০৮-৫৯৭ হি.] রচিত 'যাদুল মাসীর' (زاد المسير في التفسير)] হচ্ছে বিভিন্ন মুফাসসিরের বক্তব্য সমবেতকারী সবচেয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থ; কিন্তু তাফসীর প্রসঙ্গে নববী হাদীস কোথায়?

সহীহ ও যয়ীফ সাব্যস্তকরণ একটি এজতেহাদী বিষয়

কোন হাদীস সহীহ বা যয়ীফ সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য চূড়ান্ত বিবেচিত হয় না, যদি অনুরূপ কোন ইমাম তার বিরোধিতা করেন; বরং অগ্রাধিকার দানকারী বিভিন্ন সূত্র বিবেচনা করতে হয়। কিছু কিছু তালেবে ইলম সহীহ ও যয়ীফ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ আলেমের বক্তব্যকে চূড়ান্ত মনে করে; অথচ বিপক্ষে অনেক আলেমের অভিমত রয়েছে। কেন একজনের বক্তব্য গ্রহণ করা হবে; আরেক জনের বক্তব্য বর্জন করা হবে?

যদি কোন সাধারণ মানুষ তোমাকে প্রশ্ন করেন?

যদি তোমাকে কোন সাধারণ মানুষ মাসআলা জিজ্ঞেস করেন, তা হলে সেই অগ্রাধিকারযোগ্য জওয়াব তাকে পেশ করো, যা মনকে আশ্বস্ত করে। তার কাছে আলেমদের বিভিন্ন মতামত পেশ করার দরকার নেই।

কেননা, এতে তার বিভ্রান্তিতে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

রদ দুই প্রকার

কাফেরকে প্রতিরোধ করা ওয়াজিব। সবচেয়ে সুন্দর প্রতিরোধ হচ্ছে সেটা, যা এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, 'তোমরা প্রহার করো ঘাড়ের উপর এবং তোমরা প্রহার করো তাদের আঙুলের মাথায়।' [সুরা আনফাল: ১২] আরেক প্রকার হচ্ছে বিরোধীকে এমন বিষয়ে রদ করা, যার ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের মধ্যে বিরোধ ছিল এবং বিষয়টি সর্বসম্মত নয়। তুমি এমন রদের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ো না।

বইপুস্তক উধার প্রদান

যদি কোন মুসলমান কোন গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে চায়, তা হলে বঞ্চিত কোরো না। তবে ধার গ্রহণকারী ও কিতাবের নাম এবং ধার গ্রহণের সময়কাল রেজিষ্ট্রি বহিতে উল্লেখ করে রাখো। যাতে তোমার প্রমাণ থাকে। কেননা, মোকদ্দমার সময় বাদীকে প্রমাণ পেশ করতে হয়, আর বিবাদীর করতে হয় কসম।

গ্রন্থাগারের বিন্যাস

গ্রন্থাগার তিনভাবে সাজানো যায়–

(ক) বিষয়ভিত্তিক, (খ) বর্ণমালাভিত্তিক,

(গ) লেখকভিত্তিক।

গ্রন্থ বেশি হলে তোমার একটি তালিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলামী পত্রপত্রিকার জন্যও ড্রয়ার থাকা উচিত। যাতে প্রয়োজনের সময় নিঃসংকোচে প্রত্যাবর্তন করা যায়।

কতই না চমৎকার হত!

'মুগনী' কতই না চমৎকার, যদি তাতে উদ্ধৃত হাদীসসমূহের রেফারেন্স থাকত। 'আল-মাজমূ' কতই না চমৎকার, যদি খুরাসানী ও ইরাকী কিছু লোকের আলোচনা ছেড়ে দেওয়া হত। 'মুহাল্লা' কতই না চমৎকার, তবে যদি লেখক কিয়াস প্রমাণ করতেন এবং মানুষের সমালোচনা বর্জন করতেন। ইবনে কাসীরের তাফসীর কতই না চমৎকার, যদি লেখক কিছু ইসরাইলী রেওয়ায়েত ছেড়ে দিতেন। 'তামহীদ' কতই না চমৎকার, যদি তা সুবিন্যস্ত হত। 'যাদুল মাআদ' কতই না চমৎকার, যদি তাতে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা না থাকত। আসলে আল্লাহর কিতাব বাদে কোনটিই ত্রুটিমুক্ত নয়। 'যদি কুরআন গাইরুল্লাহর পক্ষ থেকে আসত, তা হলে মানুষ তাতে ভীষণ বিরোধ দেখতে পেত।' [সুরা নিসা: ৮২]

সমালোচনা বিশেষজ্ঞদের প্রসঙ্গ

হাদীসের সনদ পর্যালোচনাকারী আলেমদের মধ্যে আবু হাতেম, আল-আযদী ও জুয্জানী কট্টরপন্থী। বুখারী, নাসায়ী ও যাহাবী মধ্যপন্থী। ইবনে হিব্বান, হাকেম ও তিরমিযী সিথিলপন্থী।

দুই ইলম ও দুই ইমাম

যখন কাউকে আহমাদ ইবনে হাম্বলের মানহানী করতে দেখবে, তখন বুঝে নিবে যে, লোকটি সুন্নতের দুশমন। আর যখন কাউকে ইবনে তাইমিয়ার মর্যাদাহানী করতে দেখবে, তখন বুঝে নিবে যে, লোকটি মোটামুটিভাবে সালাফের আকীদা-বিশ্বাস পরিপন্থী।

সফল দাওয়াত

আল্লাহর তৌফীকের পর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব রহ.-এর দাওয়াত কামিয়াব হয়েছে তিন কারণে– ০১. উদ্যোক্তার এখলাস ০২. কিতাব ও সুন্নাহ অবলম্বন ০৩. বাস্তবতার উপলব্ধি ও সামরিক শক্তির সহায়তা।

শায়খদের সাথে দুর্ব্যবহার থেকে পানাহ চাই

কিছু কিছু বেহুদা লোকের চিন্তাচেতনা হচ্ছে আলেমদের সাথে দুর্ব্যবহার করা এবং বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করে তাদের কণ্ঠরোধ করা। উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্য তাদের নেই। আল্লাহ তাআলা জনসমাজে এসব লোকেরই দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেন। এদের ইলমের বরকত ও উপকার খুব কম। আল্লাহর কাছে তৌফীক কামনা করি।

আহলে সুন্নতের দৃষ্টিতে দাওয়াত

আহলে সুন্নতের মতে দাওয়াত দুই প্রকার– (ক) সাধারণ দাওয়াত: সাধারণ মানুষকে জরুরী বিষয় শিক্ষা দেওয়া এবং তাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা।

(খ) বিশেষ দাওয়াত: বিশেষ লোকদেরকে গোপনে উপদেশ করা। যেমন, শাসকশ্রেণি। এদের উপদেশ জনসম্মুখে প্রকাশ করা উচিত নয়। কেননা, এতে কোন ফায়দা নেই।
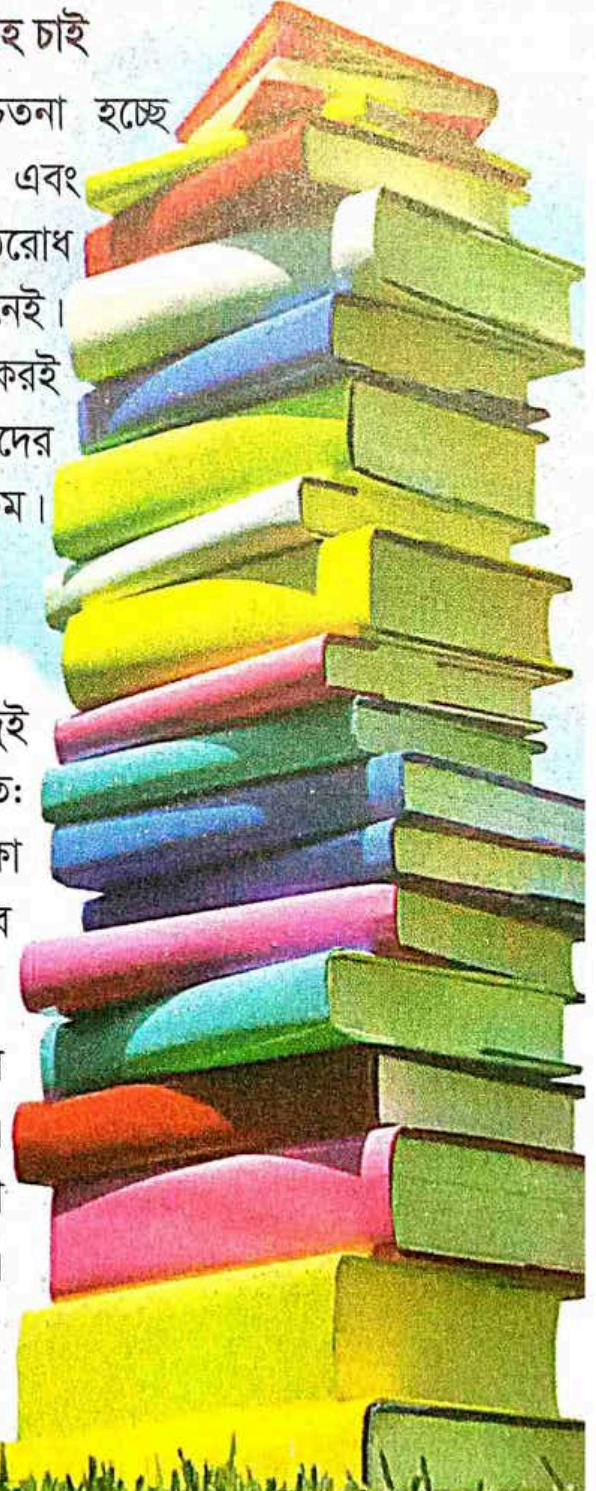
উত্তমের উত্তম : অধমের অধম

বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে উত্তমের উত্তম এবং নিকৃষ্টের চেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় তমিজ করতে পারে। অন্যথায় ভালো আর মন্দের তমিজ যেকেউ করতে পারে। দাওয়াত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের সময় তালেবে ইলমের জন্য জরুরী হচ্ছে মাসলেহাত বিবেচনা করা, বিষয়টি ভালো করে যাচাই করা। ছোট বিষয়ের আগে বড় বিষয়ের দাওয়াত দিবে। যেসব লোক সালাতই আদায় না, তাদেরকে ছবি না টানানোর ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে কি কোন লাভ হবে? অথবা যারা মদপান করে, তাদেরকে গোড়ালীর উপর কাপড় পরার পরামর্শ দিয়ে কী ফায়দা হবে?

সবশেষে

সবশেষে হে তালেবে ইলম! তোমাকে অভিবাধন জ্ঞাপন করছি। তোমার জন্য তৌফীকের দোআ করছি। হয়তো তুমিও আমার জন্য হেদায়েত ও দীনের উপর অবিচলতার দোআ করবে। আল্লাহর কাছে আবদার করছি, তিনি যেন আমাকে ও তোমাকে মাফ করে দেন। ইসলামের জন্য আমার অন্তর খুলে দেন; খুলে দেন তোমার অন্তরও। তোমার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীজী, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীদের উপর।

তোমাদের প্রিয়

আয়েয ইবনে আবদুল্লাহ
আল-কারনী
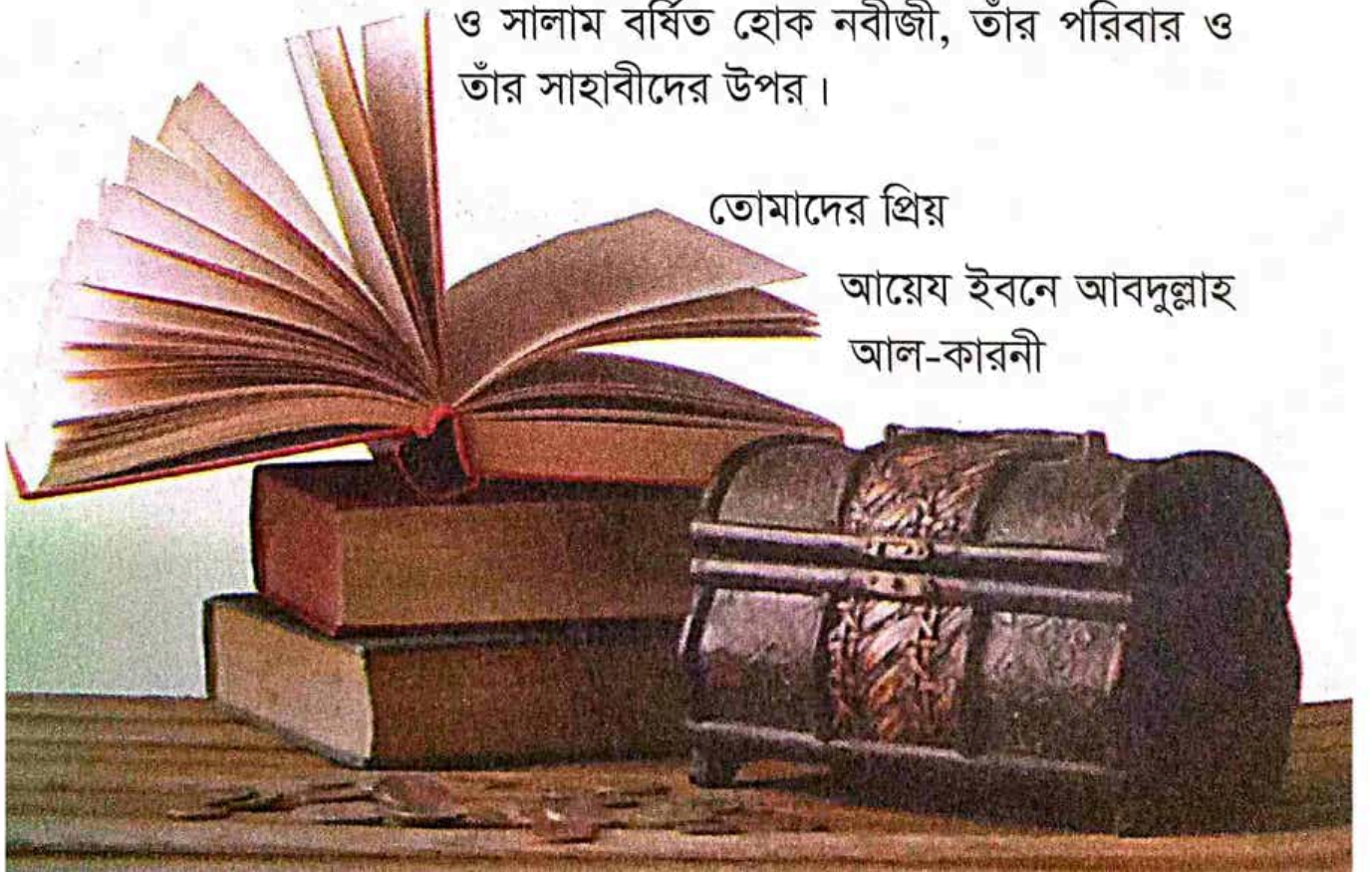
নন্দিত আরবী কথাসাহিত্যিক
ড. আয়েয আল করনীর অনবদ্য রচনা
'আশিক' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

আমি যেভাবে পড়তাম

যখন আমার শৈশব ও খেলাধুলার বয়স শেষ হল, তখন কিতাবপত্রকে সাথি, সঙ্গী ও বন্ধু বানিয়ে নিলাম। ভোরে ঘুম থেকে উঠি, তখনও কিতাব আমার সঙ্গী। সন্ধ্যা হয়, তখনও কিতাব আমার বন্ধু। ঘুমাই কিতাব বুকে নিয়ে। হাঁটতে থাকি, কিতাব হাতে নিয়ে। কিতাবের জন্য পরিবার ও ভাইবেরাদর ছেড়ে দিলাম। বন্ধুবান্ধব বাদ দিয়ে ব্যস্ত হলাম কিতাব নিয়ে। এ কারণে পার্কের আনন্দ-ভ্রমণও বর্জন করলাম।

এমন এক যামানা আমার অতিবাহিত হয়েছে যে, অধ্যয়নের কারণে আমি বাড়ি থেকে বের হতাম না। কিছু দিন খাওয়া-দাওয়ার সময়ও পড়তাম। খেতাম, পড়তাম। হাঁটতাম, পড়তাম। বন্ধুরা ঘুরে বেড়াত, আমি পড়তাম। লোকজনের জমায়েত, তাদের আনন্দ-উল্লাস দেখতাম; কিন্তু আমি কিতাব নিয়ে ব্যস্ত; পাতা ওলটানোয় লিপ্ত। দিনে প্রায় দুইশ পৃষ্ঠা পড়তাম। কখনও সারা দিনে পড়ে ফেলতাম পুরো একটি খণ্ড। কখনও একটি পৃষ্ঠা দশ বার পড়তাম। গদ্যের একটি প্যারা পড়তে পড়তে মুখস্থ করে ফেলতাম। কখনও মুখস্থ করতাম পুরো কাসীদা।

তাফসীর পড়তে পড়তে বিরক্ত হয়ে গেলে শুরু করতাম ফেকাহ। পড়তাম ক্লান্ত হওয়া পর্যন্ত। তারপর সাহিত্য পড়তাম ত্যাক্ত হওয়া পর্যন্ত।........

987-984-881-192

design : print media
shawon tower 6th fl., 2/c purana paltan, dhaka
01712523497, 01711958389